



সেই দিন সেই রাত্রি

● সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়



সেই দিন সেই রাত্রি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সেই দিন সেই রাত্রি



ট্যাঙ্কি থেকে নেমে, বাড়ির দরজা দিয়ে ঢোকান সময় একটু ভয় হল সুকুমারের। ভয়টা মায়ার জন্য। সঙ্গে জিয়া রয়েছে, যদি ওর সামনেই হঠাৎ মেজাজ গরম করে ফেলে মায়! জিয়া বেচারী খী মনে করবে?

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সে জিয়াকে বলল, সাবধান, রেলিংটার ওপর বেশী জোর দিও না। রেলিংটা একটু নড়বড়ে আছে, বাড়িওয়ালাকে বলেছি, সারিয়ে দিচ্ছে না কিছুতেই।

জিয়া লাজুক চোখে সুকুমারের দিকে তাকাল। কথা বলল না।

সুকুমারের ফ্ল্যাট তিনতলায়। দরজার সামনে এসে কলিংবেল টিপতে গিয়ে সুকুমারের ভয়টা আরও বাড়ল। ভয়ের থেকেও লজ্জটাই বেশী। মায়ার মেজাজ ঠিক থাকে না, যখন তখন রেগে যায়। মায় যখন রেগে গিয়ে চ্যাঁচামেচি শুরু করে, তখন অন্য কেউ বুঝবেই না যে আসলে মায়ার মনটা খুব নরম। জিয়া তো নতুন ছেলে, কিছুই জানে না।

দরজা খুলে দিল বাড়ির চাকর নন্দু।

সুকুমার ভেতরে ঢুকে বসবার ঘরের পর্দা তুলে জিয়াকে বলল, তুমি বস, আমি আসছি একুনি।

সুকুমার শোওয়ার ঘর, খাওয়ার ঘর খুঁজে দেখল। মায়াকে পেল না।

নন্দুকে ডেকে সুকুমার ভীতু ভীতু গলায় জিজ্ঞেস করল, বৌদি কোথায় রে? বেরিয়েছে নাকি?

নন্দু বলল, বৌদি বাথরুমে।

সুকুমার বসবার ঘরে আবার ঘিরে এল। সন্দেহ হয় এসেছে, এই সময় মায়ারোজ একবার গা ধুয়ে নেয়। যেদিন মেজাজ ভাল থাকে, সেদিন বাথরুমে গুণ গুণ করে গান গায়। আজ গান গাইছে না।

সুকুমার জিয়াকে জিজ্ঞেস করল, তুমি চা খাবে?

জিয়া টেবিল থেকে একটা পত্রিকা তুলে নিয়ে গাতা ওল্টাচ্ছিল, মুখ তুলে বলল, আপনি যদি খান এখন, আমিও খেতে পারি।

সুকুমার গলা চড়িয়ে বলল, নন্দু, দু'কাপ চা কর তো।

ইচ্ছে করেই সে একটা জোরে চাঁচালো, যাতে বাথরুম থেকে মায়া শুনেতে পার। দু'কাপের কথা শুনে মায়া নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে তার সঙ্গে বাইরের লোক আছে। ব্যপারটা আরও সরল করার জন্য সে আবার বলল, বৌদি যদি খায়, তিন কাপই কর।

মানসিক অস্থিরতা সুকুমার ঠিক গমন করতে পারছে না। বসে বসে পা নাচাচ্ছে। কোঁকের মাথায় সে জিয়াকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। এক একবার মনে হচ্ছে, না আনলেই হত। আবার জোর করে সে নিজেকে বোঝাচ্ছে।

এনেছি, বেশ করেছি। প্রত্যেকেই একটা দায়িত্ব আছে।

বিকেলবেলা অফিস থেকে ফেরার পথে সুকুমার গিয়েছিল অনুপমের বাড়িতে। অনেকদিন যায় নি। সেখানে গিয়ে দেখল বাড়িটা প্রায় হোটেল হয়ে গেছে। দশ বারোটা নতুন ছেলে। ওদের রান্নাঘরের পাশের বারান্দায় একটা বড় উনুন পাতা। সেখানে একটা বড় কেটলিতে চায়ের জল চাপানো হয়েছে। এতগুলো ঝপ নেই, তাই চা বাওয়া হল মাটির খুরিতে। বেশ আড্ডা গল্প-গুজবে জমে গিয়েছিল সুকুমার।

কিন্তু একটা ব্যাপারে তার মনের মধ্যে প্রথম থেকেই খুঁ-খুঁ করছিল। এরা সবলে রাগিরেও থাকে অনুপমের বাড়িতে, দু'বেলা খায়। এতগুলো লোকের খাওয়া-নওয়ার ব্যবস্থা করটা তো বম খরচের ব্যাপার নয়। অনুপমের মাত্র দু'খানা ঘর, তার মধ্যে একটিতে থাকে অনুপমরা জামী-স্ত্রী, অন্যটিতে গাদাগাদি করে দশ বারোজন। মাটিতে ঢালাও সতরঞ্চ পাতা, তার ওপর এখানে সেখানে ছড়ানো কয়েকটা বালিশ। এই ত্রে বিছানা—রাগিরে ছেলেগুলোকে নিশ্চয়ই খুব মশা কামড়ায়।

অনুপম পড়ায় একটা কলেজে। কতই বা মাইনে পায়। কিন্তু অনুপম বরাবরই পাগলাটে দিলদরিয়া ধরনের মানুষ। ভবিষ্যতের কথা কক্ষনে চিন্তা করে না। নিশ্চয়ই দু'হাতে টাকা ধার করছে।

অনুপমের তুলনায় সুকুমার অনেক সাবধানী।

সুকুমার এক ফাঁকে অনুপমকে জিজ্ঞেস করেছিল, এতগুলো ছেলেকে তুই কতদিন রাখতে পারবি? এ যে অসম্ভব ব্যাপার!

অনুপম কথাটা বিশেষ গায়ে না মেখে বলল, যতদিন চলে চলুক, তারপর একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে!

—কী ব্যবস্থা হবে?

—তুই বলছিস, কিছু হবে না?

—না, সে-কথা নয়। তবু তোর একার পক্ষে—

—কু-বান্ধবদের বলেছি, যদি কেউ জায়গা দেয়। কলকাতা শহরে জায়গা পাওয়া তো শক্ত—কারুর বাড়িতেই বেশী ঘর নেই।

সুকুমারের মনে এলো, তার ছাদের ছাটা এখন খালি পড়ে আছে। ঐ ঘরটায় তার ছোট ভাই বিজয় থাকতো। বিজয় যাত্র দু'সপ্তাহ আগে চাকরি পেয়ে দিল্লী চলে গেল। ঘরে একটা খাট পাতা আছে, চেয়ার-টেবিল আছে। যদিও ছোট ঘর, তবু একজন দু'জন অনায়াসে থাকতে পারে।

সুকুমার তখন কোঁকের মাথার বলে ফেলল, আমার বাড়িতে এদের দু'একজনকে নিরে যেতে পারি।

অনুপম দু'এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল সুকুমারের চোখের দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করল, তোর স্ত্রীর অসুবিধে হবে না?

—তোর স্ত্রীর যদি অসুবিধে না হয়, তা হলে মায়াই বা কেন অসুবিধে হবে?

—তোর স্ত্রী তো...

—তা হলেও ঠিক চালিয়ে লব।

সুকুমারের স্ত্রী মায়া সাত মাসের গর্ভবতী। এই অবস্থায় বেশী শরিশ্রম করা উচিত নয়। বাড়িতে দু'একজন প্রতিধি থাকলে মায়াকে খাটতেই হবে খানিকটা।

কিন্তু সুকুমার যখন একবার প্রস্তাবটা দিয়ে ফেলেছে, আর ফেরাতে পারে না। সে বারবার বলতে লাগল, কোন অসুবিধে হবে না, কোন অসুবিধে হবে না।

অনুপম তার অনেক দিনের বন্ধু। অনুপমের খানিকটা ভার লাঘব করা কি তার পক্ষে উচিত নয়?

অনুপম বলল, ঠিক আছে, তুই একজনকে নিয়ে যা। আরও কয়েকজন জায়গা দেবে বলে কথা দিয়েছে—সুতরাং আগুে আগুে সবারই ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

অনুপমই জিয়ার নাম বললে। তাকে ডেকে জিয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, এ ছেলেটা বড় লাজুক, দলের সঙ্গে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারে না।

সুকুমার জিয়াকে ভালো করে দেখল। উনিশ কুড়ি বছর বয়স। সুন্দর চেহারা, লম্বা দো-হার। ধারালো নাক ও চিবুক, কিন্তু চোখ দুটিতে খুব সরল ভাব।

সুকুমার বলেছিল, তোমাকে ভাই আমি তুমিই বলছি, আমার খেতে তো বহুসে অনেক ছোট। তুমি আমাদের বাড়িতে দিয়ে থাকবে? একটা আলান ঘর পাবে।

জিয়া সঙ্গে সঙ্গে রাজি।

বিনীত ভাবে বলেছিল, তাহলে তো আমার অনেক সুখি হয়। আমার একটা পড়াশুনা করার ইচ্ছা, কিন্তু এখনো এত গোলমালের মধ্যে পড়াশুনা করতে পারি না।

জিনিসপত্রের মধ্যে জিয়ার আছে শুধু একটা কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ। নেটা নিয়ে সে চলে এসেছে সুকুমারের সঙ্গে।

মন্দু চা দিয়ে পেড়ে। মায়া এখনো বাথরুম থেকে বেরোয় নি। একটা চায়ের

কাপ জিয়ার দিকে এগিয়ে গিয়ে সুকুমার বলল, তোমার ঘরটা ছাড়েব ওপর তো, তাই একটু বেশী গরম লাগবে—যদিও পাখা আছে, কিন্তু দুপুরে খুব গরম, তোমার একটু অসুবিধে হবে।

জিয়া বলল, আলাদা একটা ঘর, তাই তো ঘণ্টা। অসুবিধা আর কি!

—তোমার কোন কিছুই দরকার টরকার হলে চেয়ে নেবে। লজ্জা করবে না।

জিয়া একটু হাসল।

বাথরুমের দরজার ছিটকানিত টং করে একটা শব্দ হতেই সুকুমার উঠে দাঁড়াল। বলল, আমি এফুনি আসছি।

মায়া শোওয়ার ঘরের আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। শারা আর ব্লাউজের ওপর শাড়িটা আঁপা করে জড়ানো।

সুকুমার পেছন থেকে এসে মায়ার কর্সা জিজ্ঞাসা করে ওপর হেঁট রাখল।

মায়াকে মুখ ঘেঁষাতে হল না, আয়নার মধ্যেই সে স্বামীকে মুখ দেখতে পাচ্ছে।

আয়নার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, বাইরের ঘরে কে এসেছে?

—বলছি। তার অঙ্গুলি বল, রাগ করবে না?

—রাগ করব কেন?

—অগে কথা দাও, রাগ করবে না।

—কী, বাপারটা কী?

—আমি একটা ছেলেকে দিয়ে এসেছি, আমাদের এখানেই কিছুদিন থাকবে।

মায়ার ভুরুটা কঁচকে গেল। তাতে রাগের বদলে বিস্ময়ই বেশী।

—আমাদের এখানে থাকবে? জায়গা কোথায়?

—ওপরে বিজনের ঘরটা তো এখন খালিই পড়ে আছে।

—কতদিন থাকবে?

—এই কিছুদিন, যতদিন না অন্য আর একটা ব্যবস্থা হয়—

—কোথা থেকে এসেছে ছেলেটি?

—অনুপমের বাড়িতে দশ বারোজন আশ্রয় নিয়েছে। সে বেচারী এক কি করে এতজনকে সামলাবে? তাই বন্ধুবান্ধবরা সবাই দু'একজন করে নিজেদের বাড়িতে নিরে যাচ্ছে।

—পূর্ব পাকিস্তানের ছেলে?

—হ্যাঁ। খুব ভালো ছেলে। লাজুক, আর খুব চাণ্ডা হতাব। চট করে এসো, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।

মায়ার ভুরু আবার সোজা হয়ে গেছে। চুল চিকনি চাপতে চাপতে বলল, তুমি যাও, আমি একটু পরে আসছি।

সুকুমারের মনটা হালকা হয়ে গেছে। মায়া দপ করে ঘলে ওঠেনি। সেইটুকুই যথেষ্ট।

সুকুমার আবার বসবার ঘরে ফিরে এল। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এক চুম্বকে সেটা শেষ করে বলল, আমি খানিকটা বাদে একবার বেরব। তুমি তোমার ঘরে থাকতেও পারো, ঘুরে টুরেও আসতে পারো। এদিককার রাস্তা ঘাট মোড়িমুটি চিনে পেরে তো?

—এখনো ভাল চিনি না।

—আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে খানিকটা ঘুরে যে একটা বড় পানের দোকান, সেইখানেই বাস স্টপ। নব্বইর আর পাঁচ নম্বর বাস যায়—এই দুটো মনে রাখবে। এই জায়গাটার নাম গোলপার্ক। এটুকু মনে রাখলেই যথেষ্ট। কলকাতায় আগে আসনি।

—না।

—এই প্রথম? কেমন লাগছে?

—ভালো। তবে যেমন শুনেছিলাম, মানে, আগে কলকাতা সম্পর্কে কতরকম তো গল্প শুনেছি—নিজের চোখে দেখলে সেগুলো ঠিক মেনে না।

সুকুমার বলল, তা কখনো মেনে না। কল্পনায় যে জায়গা দেখা যায়, বাস্তবে তা মেনে না। তবে, কলকাতা শহরটাকে আস্তে আস্তে চিনতে হয়। বাইরে থেকে দেখার কিছুই নেই, কিন্তু এই শহরের দে একটা প্রাণ আছে, সেটা কিছুদিন না থাকলে বোঝা যায় না।

এই সময় মায়া এসে ঘরে ঢুকতেই জিয়া সজ্ঞান দেখিয়ে উঠে দাঁড়াল। মায়া হাত জেঁজর করে বলল, নমস্কার। জিয়া কপালের পাশে একটা হাত তুলল।

সুকুমার আলাপ করিয়ে দিল, আমার স্ত্রী মায়া, আর এর নাম হচ্ছে জিয়ার রহমান।

মায়া জিজ্ঞাসা করলো আপনি পাকিস্তান থেকে এসেছেন?

—হ্যাঁ। তবে এখন আমার দেশের নাম বাংলাদেশ।

—ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখানে অনেকে বলে জয় বাংলা। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন বসুন।

সুকুমার তার স্ত্রীকে বলল, তুমি ওকে আপনি বলছ কেন? তুমি বলতেও পারো, ও তো বয়েসে অনেক ছোট।

জিয়া বলল, ভাবী, আপনি আমাকে তুমিই বলবেন।

মায়া একটা চেয়ার টেনে বসে বলল, বেশ তো। আচ্ছা তাই, তুমি সব রকম রান্না খেতে পার তো? আমাদের বাড়ির রান্নায় কিন্তু বেশী আল থাকে না।

শুনোই, তোমরা খুব ভাল বাও।

জিয়া আর সুকুমার দু'জনেই হাসল। সুকুমার বলল, তোমার বাবাণা বুঝি সব

বাঙালিরাই খুব ভাল খায়? তোমার স্বামীও তো বাঙালি।

মায়া সুকুমারকে বলল, তুমি এতদিনে ঘটি হয়ে গেছ।

তারপর সে জিয়ার দিকে ফিরেজিজ্ঞেস করল, তুমি আই বাঙালি-ঘটির বাপারটা আনো? এক সময় কলকাতার এ নিয়ে খুব ঝগড়া হত। এখন অনেক কমে গেছে।

জিয়া বলল, গল্প শুনেছি।

—তোমার বাড়ি কোথায়? ঢাকা?

—এখন ঢাকা থেকে আসছি। আমাদের বাড়ি ফরিদপুরে।

সুকুমার উৎসাহে প্রায় লাহিরে উঠে বলল, ফরিদপুরে? আমাদেরও বাড়ি ছিল ফরিদপুরে। ফরিদপুরে কোথায়?

—মাদারিপুরে সার-ডিভিশন।

—আমাদেরও তো মাদারিপুরে সার-ডিভিশন।

মায়া মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, এখন তোমরা দুই বাঙালি মিলে দেশের গল্প আরম্ভ করবে নাকি? ঠিক বিহারীছের মত। দেশের গল্প শোনে আর কিছু চাও না।

সুকুমার চুপ করে গেল।

মায়া জিজ্ঞেস করল, এখন তো এখানে গাড়ি টাড়ি চলে না। ঢাকা থেকে কি কয় এলে? পায়ে হেঁটে?

জিয়া বলল, পুরোটা হেঁটে আসিনি। ঢাকা থেকে খুলনা পর্যন্ত এসেছি খানিকটা নৌকায় আর খানিকটা ট্রাকে। খুলনা থেকে হেঁটেই এসেছি, দিনের বেলা দুখিয়ে থাকতাম, রাত্তিরে রাত্তিরে হেঁটে এসেছি।—সাতলীয়া হয়ে এনিকের বর্তন, সেখানে নদী পার হয়েছি সীতরে।

মায়া দারুণ অবাক হয়ে বলল, তুমি সীতরে নদী পার হতে পারো? বাবা! সেই বিন্যাসগর মশাই সীতরে নদীপার পার হয়েছিলেন শুনেছি।

সুকুমার বলল, এতে অবাক হবার কিছু নেই। হাঁসনাবনের দিকে এই গ্রীষ্মকালে উচ্ছন্নতী নদী বেশ সর থাকে। সতরে পার হওয়া খুব সহজ, আমিও পারি!

মায়া তবু বলল, কিন্তু ঘাই বন, যদি সেই সময় ওপার থেকে গুলি চলেতো?

—চালার তো মতের মতের। তবে অন্ধকারের মধ্যে ঠিক নিশানা করতে পারবে না।

—তোমার বাহু থেকে তাহলে অনেক গুলি শোনা যাবে। সেই খুলনা থেকে পায়ে হেঁটে আসা কি সোজা কথা? এখান থেকে খুলনা কতদূর?

জিয়া ঠিক জানে না, সুকুমারের মুখের দিকে তাকাল। সুকুমার বলল, শ'খানেক মাইল হবে।

মায়া অবিশ্বাসের মূরে বলল, মোটে? আমার ধারণা তো অনেক দূর।

সুকুমার বলল, তোমরা ঘটিরা কিছুই খবর রাখো না ওদিককার। এখান থেকে ঢাকা শহরটা কত দূরে বলে তো? এখান থেকে আসানসোল যতটা দূর, এখান থেকে ঢাকা শহর তার চেয়ে খুব বেশী দূরে নয়।

—ওমা, তাই নাকি! মনে হয় যেন কত দূরে!

—তার কারণ মাঝখানে অনেকগুলো নদী আছে। সরাসরি ট্রেনে যাওয়া যায় না।

—জিয়া, তোমার বাড়িতে কে কে আছেন?

—মা, বাবা, আবু ও চার ভাই, দুই বোন।

মায়া সুকুমারের দিকে ফিরে বলল, ওরা তো সব কথা আমাদের মতনই বলে।

আমি ভেবেছিলাম অন্যরকম। তোমরা মাকে আস্থা বল না?

—আবু বলি।

সুকুমার বলল, খুব বেশী তবাব নেই। শুধু ওরা দাদাকে বড়ভাই আর জামাইবাবুকে বলে দুলাভাই, তাই না?

জিয়া হাসল।

মায়া বলল, আর জলকে তো পানি বলে?

সুকুমার বলল, সে তো কিছু হিন্দু বাঙালী ছাড়া গোটা ভারতবর্ষের লোকই পানি বলে। তুমি এখান থেকে দেওঘর মধুপুর শ্রগলই তোমাকে পানি বলাতে হবে।

—তা ঠিক। আচ্ছা তাই জিয়া, তোমাকে একটা কথা বলি, আমার শরীর এখন বিশেষ ভাল নয়—তোমাকে হয়তো বেশী বস্তু টেনে করতে পারব না। আমরা যা ভাল লাগে খাই, তাই খাবো। ঠিক নিজের বাড়ির মতন মনে করো থাকবে, কেমন?

জিয়া একটুকু চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ আন্তে আন্তে বলল, ভাবী, আমার নিজেরও একজন ভাবী আছেন, তাঁকে অনেকটা আপনার মতন দেখতে। আপনাকে গ্রহণ দেখেই তাঁর কথা মনে পড়ছে। জানি না, তিনি এখনো বেঁচে আছেন কিনা।

মায়া উল্লেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, কেন, বেঁচে থাকবেন না কেন, কি হয়েছে?

—সাতশে মার্চের পর থেকে আমার বড় ভাইয়ের আর কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না। গোলমাল শুরু হবার পর আমার বাবা-মায়েরা দেশের বাড়ি চলে গেলেন, কিন্তু ভাবী কিছুতেই ঢাকা ছেড়ে যেতে চাইলেন না!

—ওমা! তারপর আর কোন খবর পাওনি?

সুকুমার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, থাক, থাক, ওসব কথা পরে হবে।

চলো, এখন ছেলটাকে ওর ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে আসি আগে।

সুকুমার ওদের নিয়ে উঠে এল ছাদে। চারি দিকে ঘর খুলল।

মায়া বলল, ইস, ঘরটা কতকদিন পরিষ্কার করা হয় নি। খুলো জমে গেছে। দাঁড়াও, আমি আগে সাফ করে দিচ্ছি।

সুকুমারের খুব ভোরে চা খাওয়া অভ্যাস। ঠিক ছ'টার সময় নন্দু ঘরের দরজা ঠেলে, টেবিলে করে চায়ের পট আর কাপ দিয়ে যায়। মায়া চা তৈরি করে, সুকুমারকে ঠেলে ঠেলে জাগায়। প্রায় চেষ্টা না খুলেই সুকুমার চা-টা খেয়ে নেয়, তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ে। অত ভোরে খবরের কাগজ আসে না। খবরের কাগজের সঙ্গে তার দ্বিতীয় কাপ চা চাই।

মায়া সুকুমারের মাথার কাছে চায়ের কাপটা রেখে জিজ্ঞেস করল, ওকে চা দিতে হবে না?

—কাকে?

—ঐ ছেলটিকে? কি স্নেহ এর নাম?

—জিয়া? কিন্তু ও কি এর সকাল সকাল উঠেছে?

—যদি উঠে থাকে? যদি ওরও সকাল সকাল চা খাওয়ার অভ্যাস থাকে?

—নন্দুকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও না এক কাপ!

মায়া জোরে জোরে ডাকল নন্দু। নন্দু!

কোনো সাড়া পেল না।

তখন মায়ার মনে পড়ল। নন্দু তো এ সময় থাকে না। ওদের চা দিয়েই নন্দু দুধ আনতে চলে যায়। ফিরবে আর খন্টা বাদে।

—তুমিই চা-টা দিয়ে এসে না।

সুকুমার চোখ না খুলে বলল, আমি? আমি এখন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারব না!

মায়া বলল, তা হলে আমিই দিয়ে আসছি!

সুকুমার এবার চোখ মেলে। মায়া গর্ভবতী, বার বার সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করা তার পক্ষে উচিত নয়। সুকুমারের আর অজস্র-সুখ উপভোগ করা হল না। তড়াক করে উঠে বসে বলল, বা না, আমিই দিয়ে আসছি।

পাঞ্জামার দড়িটা খোলা ছিঁব, উঠে দাঁড়িয়ে সুকুমার তাতে গিঁট বাঁধলো। অনেক দিন সে এত ভোরে বিছানা থেকে ওঠেনি। একবার পেছন দিকে হাত দুটো ছড়িয়ে সে আঁকমোড়া ভেঙে ঘুম তাড়লো। তারপর চায়ের কাপটা নিয়ে উঠে এল হাদের সিঁড়ি দিয়ে।

জিয়া এর মধ্যেই ভোগে উঠেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাদের কার্নিসের কাছে।

—জিয়া, তোমার চা!

জিয়া মুখ তেরালো। তার মুখখানা অদ্ভুত রকমের বিষম। সে যেন রাজ্যের দিকে তাকিয়ে থেকেও দেখছিল অনেক দূরের কিছু।

সেই বিষম মুখেই হাসি ফুটিয়ে সে বলল, এ কি, আপনি নিজে নিয়ে এলেন?

—তাতে কি হয়েছে? বাড়িতে ঘুম-টুম হয়েছিল?

—জী।

সুকুমার তার পাশে এসে দাঁড়াল। নিজের খরখরে চিবুকে হাত কুলোতে কুলোতে সে গাঢ় স্বরে জিজ্ঞেস করল, কী, মন খারাপ লাগছে খুব? বাড়ির কথা মনে পড়ছে?

জিয়া চুপ করে রইল।

সুকুমার আবার বলল, শিশুটির একটা কিছু হয়ে যাবেই। এরকম ভাবে তো আর চলতে পারে না।

জিয়া বলল, আমরাও তো খুব আশা করেছিলাম। কিন্তু কতকগুলো মাস চলে গেল...

—যার দু'এক মাসের মধ্যেই কিছু একটা হবে।

—কান তাকায় ঘামারিৎ হয়েছে।

—কী করে জানলে?

—কান রাড্রে...পাশের বাড়িতে রেডিও চলছিল, তাতে শুনলাম, দেবদুলালবাবু খবরে বললেন...

আকাশে পাতলা মেঘ করে আছে, সেই ছায়ায় রাস্তার দৃশ্য হালকা হালকা দেখায়। পথে এখনও মানুষজন বেশী নেই। বেশ স্নিগ্ধ ঘিনঝিনে হাওয়া দিচ্ছে, খুব ভাল লাগে এই সময়টা। অথচ সুকুমারের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে, যুদ্ধ আর রক্তপাতের দৃশ্য। ইস্ কী বীভৎস একটা ছবি বেরিয়েছিল কানকের কাগজে। খুলনার কাছে দু'তিনটে সাইকেল রিক্সার ওপরে হাত পা ছড়িয়ে বৈকে চুরে মরে পড়ে আছে সাইকেল রিক্সার চালক আর আরোহীরা। বোঝাই নয়, বান সেনায়া পাশ দিয়ে যাবার সময় বেলাজলে মেশিনগানের গুলি ছলিয়ে শেষ করে দিয়ে গেছে সবককে।

পৃথিবী থেকে হারাহারি কাটাকাটি বুঝি কোনদিনই শেষ হবে না। বরং আরও বাড়বে? একটা বাঘ অন্য বাঘকে মারে না, একটা শকুনও অন্য শকুনকে মারে না—কিন্তু মানুষ মানুষকে মারে।

সুকুমার বলল, কান দুপুরে রেডিওর খবরে শুনলাম, আমাদের প্রধানমন্ত্রী লুইস বাগে গিয়ে বলেছেন, এই ক'মাসে আমাদের দেশেই প্রায় এক কোটি রিফিউজি এসেছে—এত লোককে আমাদের দেশ কতদিন ধরে বাওঁধাবে? এ ব্যাপারে সারা পৃথিবীর কোন দায়িত্ব নেই?

কথাটা বলেই সুকুমার একটা লজ্জা পেল। এক কোটি রিফিউজির মধ্যে ত্রিযাও একজন। সে হয়তো ভাববে, সে সুকুমারের বাড়িতে একটা বোঝা হয়ে আছে। সুকুমার কিন্তু সে রকম কিছু ভেবে বলে নি। জিন্দগী মাত্র একদিন হল এসেছে। আগেকার দিনে সবদেব বাড়িতেই তো এক আশ্রয় অতিথি এসে থাকত। এখন অবশ্য সে রকম দিনকাল আর নেই। তবু বিপদের সময় মানুষ মানুষকে সাহায্য করেই।

ত্রিযা বলল, নাদা, আপনাকে একটা কথা বলব? আপনার তো অনেক জানাশুনো, আপনি আমাকে একটা কাজ দিতে পারেন?

—কাজ? কী কাজ?

—মানে, কোন চাকরি।

সুকুমার হাসতে হাসতে বলল, আর ঘাই করো, এখানে কাকর কাছে কখনো চাকরি চেও না। চাকরি চাওয়া একটা অলীল কথা।

—জ্যা?

—ঠিকই বলছি। এখানে চাকরির কথা শুনেই লোকের মূখ শুকিয়ে যায়। শুধু পশ্চিম বাংলাতেই প্রায় চল্লিশ লাখ শিক্ষিত বেকার—এর মধ্যে তোমরা পাকিস্তানের, মানে বাংলাদেশের ছেলেরাও যদি চাকরির জন্য ঈর্ষোত্তীর্ণ হয়ে, তা হলে একটা ফলবুল কাণ্ড হবে। এখানকার ছেলেরাও আর সহনশীল থাকবে না তোমাদের ওপর।

ত্রিযা শুকনো মুখে বলল, তা ঠিক।

সুকুমার জিজ্ঞেস করল, তোমার কাছে সিগারেট আছে? তুমি সিগারেট খাও?

—জী না।

—চরের পর আমার একটা সিগারেট না হলে চলে না। নীচে সিগারেট আছে অবশ্য—

—আমি নিষে আসব?

সুকুমার বলতে যাচ্ছিল, হ্যাঁ, কিন্তু থেমে গেল। রাহিববেলা মাস্তা একটা পাতলা নাইটি পরে শোয়। এখনো বোধ হয় সেটা বদলে শাড়ি পরে নি। এই অবস্থায় ত্রিযা নীচে গেলে মায়া নিশ্চয়ই খুব লজ্জা পেরে যাবে।

সে মুখে বলল, থাক, আমিই যাচ্ছি।

সিড়ির দরজায় কাছে এসে সুকুমার আবার তিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি প্রফ দেখতে জানো?

—প্রফ? মানে ছাপার প্রফ?

—হ্যাঁ।

—জানি। আমি আওয়ামী ছাত্র লীগের একটা পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম।

—ঠিক আছে। আমার সঙ্গে কয়েকটি বইয়ের দোকানের জানাশুনো আছে। ওরা অনেক সময় বাইরের লোক দিয়ে প্রফ দেখায়। এদের বলে দেখি, যদি সে রকমকিছু পাওয়া যায়। তোমার হাত-খরচটা অন্তত উঠে যেতে পারে।

—তহলেও খুব ভাল হয়।

—দেখি।

সেদিন আর সুকুমার আবার বিছনার তিরে গেল না। বরং বাজার করতে বেরল। অন্যদিন সাধারণত চাকরকেই বাজারে পাঠানো হয়, আজ সুকুমার নিজে পছন্দ করে এক গাদা মাছ আর তরিতরকারি কিনে আনল। সে নিজে অবশ্য তার কিছুই খেতে পেল না। তারেক ঠিক সাড়ে ন'টায় অফিসে বেরতে হয়—ডাল ভাত আর দুটো মাছ ভাজা খেয়ে সে দৌড়ল।

সবর দরজায় কাছে চিঠির বাজ। তার মধ্যে তিনখানা চিঠি বোঝা হয় কাল সন্ধ্যা থেকেই পড়ে আছে। সুকুমার চিঠি তিনখানা নিজের পকেটে ভরে অফিসে চলে গেল।

অফিসে ফোড়ার বিকটাতাই সুকুমারের বেশী কাজ থাকে। সুকুমারদের অফিসটা ছিল ইংরেজদের, এখন কিনে নিয়েছে এক মাদ্রাসারী। মাদ্রাসারী মানে আগেকার যতন উঁচুওয়াল ফতুয়াপায়া ব্যবসারী নয়। ঢালঢালনে পাক্সা সাহেব, ছ'সাতবার বিলেত ঘুরে এসেছে—অবশ্য এখনো বাথরুমে ঘাবার সময় কানে পৈতে দেয়। কলকাতা শহরে এই মাদ্রাসারীর আরও তিনটি ব্যবসা এবং সাতখানা বাড়ি আছে। নাম, অজিতপ্রসাদ আগরওয়াল।

সুকুমার অফিসে গিয়েই শুনল, মিঃ আগরওয়াল তার খোঁজ করেছে। জলের গেলসে এক চুমুক দিয়ে সুকুমার দরজা ঠেলে বড় সাহেবের ঘরে ঢুকল।

প্রকাণ্ড টেবিলের এক পাশে বসে থাকে আগরওয়াল। টেবিলের এ পাশে প্রায় আট দশটি চেয়ার—এ সবই বাইরের লোকের জন্য। নিজের কর্মচারীদের কক্ষলো সে বলতে বলে না।

সুকুমার ভেতরে এসে একটা চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়াতেই আগরওয়াল বলল, মিত্রবাবু, আপনি কি এ অফিসটা বন্ধ করে দিতে চান?

সুকুমার তটুই হয়ে বলল, কেন স্যার?

—আপনি কাজ কী নোট লিখে গেছেন?

—গোনটার কথা বলছেন?

—এই যে আপনি লিখেছেন—গভর্নমেন্ট আমীরের কাছে দশ হাজার তেরপল চেয়েছে—আর আপনি লিখেছেন ঐ তেরপল আমাদের স্টকে নেই? গভর্নমেন্টের অর্ডার কেউ কোরায়?

—মানে, স্যার, যা স্পেশালি কেশান চেয়েছে—সেই সাইজের কিছুই তো আমাদের স্টকে নেই।

—সেই মানে? জুলাইতে আমরা যে মালটা নিলাম—

—সেটা তো অনেক ছোট।

—হোক ছোট।

—স্যার, গভর্নমেন্ট চেরেছে একশো কুড়ি স্কোয়ার ফুট, আর আমাদের আছে পঁচাত্তর স্কোয়ার ফুট, তাও অনেক পাতলা—এ দিয়ে মজবুত ক্যাম্প হয় না।

আগরওয়াল কান চুলকোতে চুলকোতে বলল, মিত্রবাবু, আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? রিফিউজিরা এখানে এসেছে কি আরাম করার জন্য? এ কি তাজব কথা। কোন রকমে থাকতে পারলেই হল? একশো কুড়ি স্কোয়ার ফুট তেরপল যদি না গাওয়া যায়, তাহলে কি তারা সোলা মাঠে থাকবে? পঁচাত্তরেই থাকবে। খোলা মাঠ ভালো, না পঁচাত্তর স্কোয়ার ফুট ভালো? বলুন?

সুকুমার বললো, জারগা অনেক কমে যাবে, এত বেশী লোক...

আগরওয়াল আর ধমক দিয়ে বলল। একটু কমনসেন্স অ্যাড্রাই করুন। জারগা যদি কম হয়, গভর্নমেন্ট আরও বেশী কিনবে। যান, এগুলোকেই একশো কুড়ি স্কোয়ার ফুট বলে চালান। গভর্নমেন্ট এখন কত তাকাতাড়ি পেমেন্ট নিয়ে—এই সুযোগ কেউ ছাড়ে? কে মেনে দেখতে যাচ্ছে কোনটা কত স্কোয়ার ফুট?

সুকুমার চুপ করে গেল। বড়রের কাছে রিফিউজি ক্যাম্পগুলোর জন্য তারা কয়েক মাস আগেও তেরপল সাহায্য করেছে। এ বছর বর্ষা হয়েছে সাজঘাতিক—অনেক জায়গায় বড়-বৃষ্টিতে ক্যাম্প উল্টে গিয়ে লোকগুলোর অবস্থা হয়েছিল আরও দুর্বিষহ। গভর্নমেন্ট নতুন করে তাঁবু বানাবার জন্য তেরপলের অভাব দিয়েছে। এখন আবার ছোট মাপের পাতলা জিনিস চালান হবে? বড়-বৃষ্টির সময় তো এখনো পেরিয়ে যায় নে!

সে খণিগভাবে বলল, স্যার, এ তেরপলগুলো শুধু ছোট নয়, পাতলা। যদি আবার ছিঁড়ে যায়—

—ছিঁড়ে গেলে গভর্নমেন্ট দাবার কিনবে?

—কিন্তু লোকগুলোর যে বই হবে!

আগরওয়াল অধিক হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল সুকুমারের দিকে। যেন মানুষের কণ্ঠ একটা অদ্ভুত কথা।

আগরওয়াল হঠাৎ টেবিলে এক চাপড় মেরে বলল, তারা কি এখানে আরাম করতে এসেছে? বলুন, সে কথা বলুন আগে। রোজ আসছে লাগে লাগে—ওদের কত দিন আমরা খাওয়াবো, ঈদ খাওয়াবো! আপনার বাড়িও ইস্টবেঙ্গলে ছিল না?

—হ্যাঁ স্যার!

—আশ্চর্য, এরাই আপনদের ওখান থেকে তাকিয়ে দিয়েছে, জারগা-জমি কেড়ে নিয়েছে, তবু আপনাদোই যত বেশী দরদ ওদের জন্য! কেন?

সুকুমারের চোঁটে উত্তর এসে গিয়েছিল, যারা ভারত বিভাগ মেনে নিয়েছিল—তাদের জিজেস করুন সে কথা। সেই সব নেতারা অনেকে এখনো বেঁচে আছেন। সে সব পুরোনো কথা এখন আর চিন্তা করে লাভ নেই। এখন ওদের বিপদ। বিপদের সময় সবাইকেই উচিত সাহায্য করা।

কিন্তু মালিকের মুখে মুখে তর্ক করা চলে না। এর মধ্যেই সুকুমার ভয় পেয়ে গেছে। এত কথা তার বলা উচিত হয়নি।

আগরওয়াল আবার বলল, বাঙ্গালীরা অদ্ভুত। নিজের কিসে ভাল হয়, তা এরা কিছুতেই বোঝে না। বরং নিজের ক্ষতি করার জন্যই সব সময় ব্যস্ত। বলুন, ঠিক হয়েছে কি না?

সুকুমার মুখখানা তৈলাক্ত করে বলল, হ্যাঁ স্যার!

একটু বাদে সুকুমার নিজের টেবিলে ফিরে এল। মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে। ভেতরে ভেতরে একটা অবরুদ্ধ স্ফোভ। চাকরি করতে এসে মানসম্মানটুকুও টিকিয়ে রাখা যায় না। এ চাকরিটা ছেড়ে আর একটা চাকরি যদি পাওয়া যেত!

আগরওয়াল পুতুর চুঁরি করতে চলেছে। বড়রের কাছে দু'বার রিফিউজি ক্যাম্পগুলো দেখে এসেছে সুকুমার। বিশ্বাসই করা যায় না, কি করে হাজার হাজার মানুষ এত গাদা-গাদি করে থাকতে পারে দিনের পর দিন। গভর্নমেন্ট কম টাকা তো খরচ করেছে না—কিন্তু এই সব আগরওয়ালদের জন্য ঠার বেশীর ভাগ টাকাই চলে যাচ্ছে অন্যদিকে। সুকুমার নিজেও তাকে একটা ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু তার আর কী উপায় আছে? প্রতিবাদ করতে গেলে সে শুধু শুধু নিজের চাকরিটা হারাবে। এই পৃথিবীতে এখন একা কারও প্রতিবাদের কোনো দাম নেই।

লাকের সময় সুকুমারের খেয়াল হল, তার পকেটে চিঠিখানা চিঠি আছে, খাবার খেতে খেতে সে চিঠিগুলো খুলে পড়তে লাগল।

একটা চিঠি লিখেছে তার ভাই বিজল। নতুন চাকরিতে সে বেশ ভালই আছে। অফিস থেকে কোয়ার্টার পেয়েছে খুব চমৎকার।

আর একটা চিঠি মাইবাবার কোনো ভক্তের। সেই চিঠি অবার কুড়ি কপি করে অন্যদের পাঠাবার নির্দেশ। না পাঠালে খুব বিপদ। সে চিঠিখানা সুকুমার তত্কুনি বাজে কাপড়ের বুড়িতে ফেলে দিল।

তৃতীয় চিঠিখানা পড়েই সে দারুণ চমকে উঠল। এই রে, এখন কী উপায়? এ রকম মজাবনার কথা তো তারা রাখতে আসে নি!

চিঠিখানা লিখেছে মায়াব ছোটবোন মূলখা। কানপুর থেকে।

মূলখার বি.এ. পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে, সে সেকেন্ড ক্লাস অনার্স পেয়েছে। এম, এ. পড়বে কিনা এখনো ঠিক করেনি। তার আগে সে কলকাতার আসতে চায়। আগামী সপ্তাহেই সে কলকাতায় আসবে।

সঙ্গে আসছে সুসুখার মা অর্থাৎ সুকুমারের শাকুণ্ডী। মায়ার বাচ্চা হবে, সেই সময় তিনি কাছাকাছি থাকতে চান। এর আগে তিনি চিঠি লিখেছিলেন মায়াকে কানপুরে পাঠিয়ে দিতে। মায়ী নিজেই যেতে চায়নি। একা একা সুকুমারকে ফেলে রেখে সে যেতে চায় না। তাই মায়ার মা নিজেই আসছেন মেয়ের দেখাশুনা করতে।

সুকুমারের কপালে ঘাম এসে গেল। সুসুখা আর তার মা থাকবেন কোথায়? কলকাতার ঐদের আর কোনো আত্মীয়সজন নেই। সুকুমারের বাড়িতেই উঠতে হবে। তাছাড়া মায়াকেই বন্দন দেখাশুনা করবার জন্য আসছেন, তখন এ বাড়িতে ছাড়া অন্য বাড়িতে থাকবেনই বা কেন?

কিন্তু জায়গা কোথায়? সুকুমারের তিনতলার ফ্ল্যাটে দুটো মাত্র বড় ঘর, আর একটা চিলতে বসবার ঘর। বড় ঘরের দুটোর মধ্যে একটাকে খাবার ঘর করা হয়েছে। ওদের কোথায় জায়গা দেওয়া হবে?

খাবার ঘরেই ওদের থাকবার ব্যবস্থা কোনো রকমে করে দিতে হবে। অসুবিধে হবে বেশ। ছাদের ঘরটা এই সময় খালি থাকলে সুকুমার নিজে চলে যেত ছাদের ঘরে—ওদের তিনতলাটা ছেড়ে দিত। কিন্তু ছাদের ঘর জিয়া আছে।

জায়গার সমস্যার চেয়ে আর একটি বড় সমস্যা আছে। বাড়িতে জিয়া রয়েছে, এটা মায়ার মায়ের পছন্দ হবে তো? ওঁর একটু ছোঁরাছুরির ব্যতিক্রম আছে। ট্রেনে উঠে রান্না কোন পাবার খান না। একজন মুসলমানদের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে উনি যদি আপত্তি করেন? পূর্বনো আমলের লোকদের মধ্যে এইসব সংস্কার এখনো তো রয়ে গেছে?

সুকুমারের আপশোস হতে লাগল। কেন সে কাল দুম করে জিয়াকে নিয়ে এল নিজের বাড়িতে? তার বদল অনুপমকে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করলেই হত। এখন জিয়াকে তো আর চলে যেতে বলা যায় না? মাত্র একদিন হল এসেছে! কোনক্রমেই তাকে খুব কুটে কিছু বলা যাবে না।

অনুপম যে কোন সাহায্যই চায় নি। টাকা-পয়সাও চায় নি। নিজের বাড়িতে দশ-বারোটি অতিথি এনে সে মহানন্দে আছে। তাই দেখেই সুকুমারের বিবেকে একটু খোঁচা লেগেছিল। অনুপম নিঃস্বার্থভাবে যে কাজ করছে, তাই একটু সাহায্য করা উচিত নয়? কিন্তু তখন কে জানতো, এতো বাহুল্য!

সুকুমার কোনো উপারান্তর খুঁজে না পেয়ে চুপ করে বসে রইল।

মায়ী আরো একটি বড় মাহের মুড়ো খেতে দিয়েছে জিয়াকে।

জিয়া খওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বড় লাজুক। কিছু দিতে এলেই আগে থেকে হাত বাড়িয়ে না না করে। মায়ীই তাই বাড়িতে আলাদা করে সাজিয়ে দিয়েছে।

প্রথমেই মাহের খোল দিয়ে তাত মাখতে দেখে মায়ী অবাক হয়ে বলেছিল, এ কি! আগে ভাল ছিল না?

জিয়াও সমান অবাক হয়ে মুখ তুলে বলল, আগে ভাল নেব?

—হ্যাঁ কেন, ভাল বুঝি পছন্দ কর না?

—তা করি। কিন্তু ভাল তো শেষে খায়!

মায়ী হেসে ফেলে বলল, ওমা, এসব কথা জীবনে শুনিনি! আগে মাহের খোল দিয়ে তারপর ভাল?

জিয়া বলল, আমরা একেবারে শেষে ভাল খাই!

—এ আরার কী অদ্ভুত নিয়ম! ১৮.১০.৩৪০২/০৫

—কি আপনাদের নিয়মটাই বা কি ভাল? আগে তো লোকে ভাল জিনিসটা খায়—যেমন, মাহ বা মাংস। আগেই ভাল—তারকরি এসব বাজে জিনিস দিয়ে পেট ভরিয়ে লাভ কী?

—কি দানি বাবা, আমরা তো এই রকমই খাই। ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছে, যেমন তাকে সুবিধে সেই তাবে খাও।

জিয়া মাহের খোল দিয়ে তাত মাখল। তারপর মুড়োটাকে খুব যত্নে, পরিপাটি করে, অত্যন্ত কাঁচা ভিঁড়িয়ে খেয়ে শেষ করল।

মায়ী খুব ভাবে তাকিয়ে রইল সেদিকে। তাদের বাড়িতে কেউ মাহের মুড়ো খায় না। সে নিজে তো পছন্দই করে না, সুকুমারও কাঁচা-কাঁচা বেশী পছন্দ করে না। সেইজন্য মুড়ো শুধু মাহ সাধারণত আনাই হয় না।

মায়ী নিজের আনন্ড মতন তাত দিয়েছিল জিয়াকে। জিয়া আরও দু'বার তাত চেয়ে নিল তারপর বলল, বৌদি, অনেকদিন বাদে খুব তৃপ্তি করে খেলাম। এতগুলো বদতো দেশ ছাড়ার পরে আর খাই-ই নি?

মায়ী বলল, এ আর এমন কি! রান্না ঠিক হয়েছে? নাকি আর একটু মাজ হল ভাল হত?

—না, না। খুব সুন্দর রান্না। আপনাকে আমার নিজের এক বৌদির কথা বলেছিলাম না, তিনিও এরকম রান্না করেন।

—তাইনাকি? ও হ্যাঁ, তোমার দাদার কথা কালকে পুরোটা শোনা হল না। তোমার দাদা এখন কোথায় আছেন?

—জানি না।

একটু চুপ করে থেকে জিয়া আবার বলল, আমার দাদা ঢাকার ইন্ডিয়ান বঙ্গে একটা খবরের কাগজে কাজ করতেন। গোলমালের মধ্যে কদিন বাড়ি থেকে বেরোন নি—সাতশে মার্চই জোর করে গেলেন কাজে। তারপরই গুলিগোলা শুরু হয়ে গেল—ইন্ডিয়ান কাগজের অফিসের মধ্যে ফারারিং জ্বল—

—তোমার দাদা তখন তার মধ্যে ছিলেন?

—না বোধ হয়। দাদার ভেত বড়ি পাওয়া যায়নি। অনেক খুঁছেও আমরা দাদার ভেত বড়ি কোথাও পাই নি। দাদা বাড়িতেও কিরে আসেন নি।

—তা হলে নিশ্চয়ই কোথাও পালিয়ে আছেন।

—আমার দাদা খুব তেজস্বী লোক। উনি মুক্তিযোদ্ধার যোগ দিতে পারেন। কিন্তু তা হলে কোন খবর দেন না কেন? কোন না কোন উপায়ে খবর জোগ দিতে পারতেন! আর এক হতে পারে, তিনি সেই সময়েই বড়ার পেরিয়ে এগারে চলে এসেছিলেন। এদিক থেকে ওদিক তো খবর পাঠাবার কোন উপায় নেই।

—নিশ্চয়ই তোমার দাদা বেঁচে আছেন।

—আমার ভাবীরও সেই ধারণা। সেইজন্যই তো তিনি ঢাকা ছেড়ে কিছুতেই নড়েন না।

—তোমার বৌদির আবার কোন জ্ঞতি হবে না তো?

—তা নাও হতে পারে। ঢাকা শহরে এখনো তো অনেক মানুষ-জন আছে। মেয়ে লোকদের এমনিতে কোন ভয় নেই—তবে এক হতে পারে, বৌদিকে ধরে নিয়ে গিরে দাদার কিংবা আমার খবর জানবার জন্য ছাত্তো টাটার করবে!

—ইন্! তোমার বৌদি গ্রামে চলে যাচ্ছেন না কেন?

—জেন! বড় জেদী মেয়েয়ে।

—তোমার বাড়িতে আর কে কে আছেন?

জিয়া প্রথমেই বলল, আমার মা নেই।

তারপর একটু থেমে বলল আর এক বা আছেন, আপনারা যাকে সত্যতো মা বলেন।

মারা বল, সংমা?

—জী। আর আমরা সাত ভাই বোন।

—তুমিই সবচেয়ে ছোট?

—না, আমার পরে আরও তিন বোন আছে।

—বাড়ির জন্য মন কেমন করে না? কতদিন হয়ে গেল।

—সাত মাস।

খাওয়া অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। গল্প করতে করতে হাতের ঐটো শুকিয়ে গেছে হাতেই। অন্য অন্য দুপুরবেলা মারাকে একলা একলাই খেতে হয়।

জিয়া বলল, বৌদি, এক গেলাস পানি... এক গেলাস জল দিন।

মারা হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, তুমি না হয় পানিই বলো, জল। বলার দরকার নেই। এখানে জল বলা অভ্যাস করে ফেললে ঢাকতে ফিরে হাতো জল বলে ফেলবে।

—ঢাকতে কি আর ফিরতে পাবব?

—নাও, কেন ফিরবে না। শিগগিরই একটা কিছু হেতুনেত্ত হয়ে যাবে।

—করে অন্ন হবে। চীন, আমেরিকা, ইংলণ্ড—সবাই তো পাকিস্তানের সাপোর্টার।

—ওসব আমি বুঝি না। যা অন্যায়, তা কখনো বেশিদিন চলতে পারে না। একটা দেশের অতঃকালো জোক কি চিরকাল অন্যায় খেনে নেবে!

—বৌদি, রাজনীতিতে এখনো ন্যায় অন্যায় বলে কিছু নেই। এখনো জোর যার মুলুক তার।

—কয়েকদিন আগে তোমার দাদা বেডিওতে ঢাকা সেন্টার শুনছিলেন। ইষ্টাং শোনা গেল সেনারেল নিয়াজীর বক্তৃতা। শোনার না কোবার খেন বক্তৃতা বরাছিলেন। কী বললেন জানো? দস্ত করে বললেন, যদি আমরা ইচ্ছে করি, আজই গোলাবর্ষণ করে কলকাতা শহরটা ধ্বংস করে দিতে পারি। কী সাহস!

—ত ইচ্ছে করলে পারে বোধ হয়।

—ইন্! আর আমাদের বুঝি আর্মি নেই? তারা চুপ করে বসে থাকবে?

—আপনি জানেন না বৌদি, এক একটা পাকিস্তানী সোলজার মানে দৈত্য, তারা একজনই তিনচারজন ইণ্ডিয়ান সোলজারের সমান।

—আই নাকি? কে বলেছে তোমাকে?

—তাপনিতো এসব পাঠান খানসেনাদের দেখেন নি। আমরা দেখেছি, দেখলেই বুক কাঁপে। ইয়া লহা, ইয়া চণ্ডা।

—তুমিও তো ইণ্ডিয়ান সোলজারদের দেখ নি। তাছাড়া আজকালকার যুদ্ধ তো গানের জোরে হয় না, হু হু বুদ্ধিতে আর অস্ত্রবলে।

—আমাদের খানসেনারা কী বলতো জানেন? ইণ্ডিয়ান আর্মি।

—ঠাট্টা করে বলতো, ওরা তো গান্ধীর দেশের সোলজার—ওদের বন্দুকে গুলির বকলে লজ্জাখুঁস থাকে।

—আচ্ছা, সেই লজ্জাখুঁস খাইয়েই ওদের কাবু করে দেখ, দেখো! চল, হাত ধরে নাও।

হাত তিন ধুয়ে ওপরে উঠে যাওয়ার আগে জিয়া লাজুক ভাবে জিজ্ঞেস করল বৌদি, দু'একটা বই টাই আপনার আছ থেকে নিতে পারি?

মারা বলল, ইয়া নাওনা—বসবার ঘরের তাকে দেখ অনেক বই আছে, যেটা তোমার ইচ্ছে।

—ওগুলো দেখেছি। আপনার কাছে কবিতার বই নেই?

—কবিতার বই? দু'একখানা আছে, বেশী নেই—তুমি বৃষ্টি কবিতা পড়তে ভালবাস?

—জী।

—তুমি নিজেও কবিতা লেখ নাকি?

—লজ্জায় মাথা খুঁকিয়ে জিয়া বলল, জী।

মায়া খুশীতে কৌতুকে বললে হয়ে উঠে বলল, তাই নাকি?

বাঃ! আমাদের বাড়িতে একজন জলজ্যান্ত কবি এসে রয়েছে। তোমার দাদাকে এ সবটা দিতে হবে তো। তোমার কবিতা আমাদের পড়ে শোনাবে না?

জিয়া আরও বেশী লজ্জা পেয়ে বলল, সে এমন কিছু নয়।

অফিস থেকে ফেরার পথে সুকুমার সোজা বাড়ি না ফিরে একবার গেল অনুপমের আস্তানায়। সেখানে এর মধ্যে আরও দু'দিনটি ছেলে কমে গেছে। এখন আছে মোট আট জন।

অনুপমের স্ত্রী শান্তাও একটি অফিসে চাকরি করে, সেও এইমাত্র ফিরেছে। একটি ছেলে সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে এক কাপ গরম চা এগিয়ে দিয়ে বলল, ন্যান বৌদি।

ছেলেটির নাম আতাউর। সবাই আতা আতা বলে ডাকে।

শান্তা বলল, আতা, তুমি এত সুন্দর চা বানাও, তুমি এখানে একটি চায়ের দোকান খুললে পার।

আতাউর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, তা খুলতে পারি। আপনি ক্যাপিটালটা ন্যান।

শান্তা বলল, একটি চায়ের দোকান খুলতে কত টাকা লাগে? পর ভাড়া নেবার দরকার নেই, আমাদের বাইরের ঘরটতেই বসবে। —আর তো কয়েকটা কোঁচি আর কাপ ভিস কেনা।

অন্য একটি ছেলে বলল, কাপ ভিস না, ভাঁড়। ভাঁড়ের চা-ই বেশী চলে দেখেছি।

অনুপম বলল, কিন্তু বলকাতার চায়ের দোকান চালাবার আসল বিপদ কী জান? অনেকেই এসে ধারে ধারে। ধার না দিলে খদ্দেরও আসবে না। শেষ পর্যন্ত এত ধার জমে যাবে যে হিসেবের কুন কিনাবা পাবে না।

আতা সগর্বে বলে উঠল, হিসাবে আমার কেউ ঠকতে পারবে না। আমি ইকনমিকসের ছাত্র।

সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

এখানে বেশ একটা আনন্দময় পরিবেশ। সবাই মিলে সুন্দর একটা শিকনিফের আবহাওয়া তৈরী করে রেখেছে।

তবু এদের মধ্যে সুকুমার একটু সঙ্কটিত বোধ করল। সে মনে মনে ভেবে এসোলে, গোপনে অনুপমকে অনুরোধ করবে, যদি জিয়াকে এখানে ফিরিয়ে আনা যায়।

কিন্তু এখানে এসেই বুঝতে পারল, সে প্রস্তাব তোলা অসম্ভব। সকলেই তাকে ডাববে, স্বাধীন। নীচ। অনুপম এতগুলি ছেলের খাকা খাওয়ার ভার নিয়েছে আর সে একজনেরও ভার নিতে পাবল না?

কিন্তু ঠিক এই সময়েই যে সুকুমারের শ্যালিকা আর শাশুড়ী এসে হাজির হবে, তা কি সে আগে ভদতো?

শান্তা জিজ্ঞেস করল, জিয়া কেমন আছে সুকুমারদা? ওর ওপর আমার বেশ মায়া পড়ে গিয়েছিল, ও চলে যাওয়ার কাল থেকে আমার মনটা বেশ খারাপ হয়ে আছে।

অন্য একটি ছেলে বলল, বৌদি, একদিন তো আমরা সবাই চলে যাব। তখন আপনি মন খারাপ করবেন?

শান্তা বলল, না। তোমরা যেকোনো তোমাদের স্বাধীন দেশে ফিরে যাবে—সেদিন তো আমি আনন্দ করব। অবশ্য একটু মন একটু খারাপও লাগবে!

আতা বলল, একটু একটু! বৌদি আমাদের ভালোবাসেন না, শুধু জিয়াকেই ভালোবাসেন!

—তুই চুপ কর তো আতা। বলুন সুকুমারদা, জিয়ার খবর বলুন।

সুকুমার বলল, সে তো ভালই আছে তবে খুব লাজুক তো, মুখ খুটে কিছু চায় না।

আতা বলল, মোটেই লাজুক না। বিটমিটা শরতন!

—আবার আতা! চুপ করবি?

সুকুমার বলল, আমার মনে হয়, মাঝে মাঝে ও একা থাকলে কাঁদে। এখানে বোধ হয় সকলের সঙ্গে মিলে মিশে বেশী ভাল ছিল। আমার ওখানে হুতো ওর একা একা লাগছে।

অনুপম অন্য ছেলেদের দিকে হাত দেখিয়ে বলল, ওরা সবাই এক এক সময় মুখ খুঁকিয়ে কাঁদে। কাঁদবে না? নিজের দেশের কথা ভেবে কাঁদবে না? মা বাপ মাঝীস্বজন কে কোথায় আছে জানে না—

শান্তা বলল, জিয়ার পক্ষে আলাদা থাকাই ভাল। এখানে তো সব সময় হৈ চৈ। ও একটু পড়াশুনা করতে চায়। সেই সুযোগ পাবে।

অনুপম বলল, কয়েকটা কাজের কথা বলে নিই অগে। জিয়াকে বলিস

মুজিবনগরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে। আর মুক্তিবাহিনীতে নামটাও যেন লিখিয়ে
মাখে— শিগগির ট্রেনিং-এর জন্য ডাক পড়বে।

সুকুমার বলল, ট্রেনিং? এটুকু ছেলে যুদ্ধ করবে নাকি?

আতা বলল, এটুকু মানে? আপনি ওর বয়স কত মনে করেন?

—আঠোরো-উনিশ!

—মোটাই না। বাইশ। তার আঠোরো-উনিশ হইলেই বা কি? দ্যাশের জন্য
আমরা সবাই যুদ্ধ করব। আমরা দ্যাশের জন্য আমরা যুদ্ধ করব না তো করবে
অইনো?

শান্তা জিজ্ঞেস করল, অইনো মানে?

অনুশম বলল, তুমি বাঙাল ভাষা একদম বোঝো না! অইনো মানে হচ্ছে
অন্যলোক। অনেকদিন বাদে বেশ খাঁটি বাঙাল ভাষা শুনছি— কলকাতায় আগে
খুব শোনা যেত। পূজার সময় অনেকেই তখন দাশে যেত! আমিও যেতাম।
জানো আতা, যে দেশটা তেমনদের ছুবে— সেটা এক সময় আমাদেরও দেশ
ছিল— কিন্তু আমরা সেখানে কখনো যাব না!

শহীদ নামে একটি ছেলে বঙ্গল, কেন যাবেন না? নিশ্চয়ই আপনারাও
আসবেন।

—বেড়াতে যেতে পারি। থাকতে তো আর যাব না!

—কেন থাকবে না? আপনাদের বাড়ি তো আছে, বিক্রি তো করেন নি?

—তাহলেই হয়েছে আর কি! আমরা যদি অতদিন আগে ছেড়ে-আসা বাড়িতে
আবার যাই, তাহলেই দাশ-হাঙ্গামা শুরু হয়ে যাবে। যুদ্ধের চেয়ে দাশ-হাঙ্গামা
অনেক খারাপ। যুদ্ধের তবু কিছু নিয়ম নীতি থাকে, যুদ্ধ বীরের মতন মারা
যায়, কিন্তু দাশ-হাঙ্গামা করে অপূরণযোগ্য। না, আমরা আর আমাদের বাড়ি ঘর
ফেরৎ নিতে যাব না। আমরা এখন অন্য দেশের নাগরিক।

প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্য সুকুমার বলল, আচ্ছা অনুশম, মুজিবনগরটা কোথায়
রে? কাগজে প্রাইম নাম দেবি, কিন্তু জায়গাটা ঠিক কোথায় তা তো বলে না!

অনুশম একটু চুপ করে গেল। তারপর বলল, বিদেশী সাংবাদিকরাও জায়গাটা
হানা হয়ে খুঁজছে। কেউ টের পারনি এখনো।

—তাহলে? কেউ যদি যোগাযোগ করতে চায়।

—মুজিবনগর বেশীদিন এক জায়গায় থাকে না। এটাকে বঙ্গভূমি পারিস, একটি
চলন্ত রাজধানী। স্বাধীনতার লড়াইয়ের সময় দেশের বাইরেও অস্থায়ী সরকারের
এই রকম চলন্ত রাজধানী থাকে— ইতিহাসে অনেকবার দেখা গেছে।

আতা বলল, একদিন আমরা এই মুজিবনগরকে মাথায় করে ঢাকায় নিয়ে
যাব।

একটু বাদে সুকুমার বেরিয়ে পড়ল ওখান থেকে। বাসে না উঠে হাঁটা পথ
ধরল। অনুশমের বাড়িতে ঐ সব ছেলেদের সঙ্গে কথাবার্তা বললে বেশ একটা
উত্তেজনা বোধ হয়। বাঙালীরা বঙ্গবঙ্গ কোন যুদ্ধবিগ্রহ করে নি। এতবল পর
বাঙালীর একটা ঐতিহাসিক যুদ্ধ মেতেছে। যুদ্ধ এখনো পুরোপুরি শুরু হয়নি
ঠিকই, কিন্তু আকাশে বাতাসে যেন তার গন্ধ ভাসছে। সুকুমার নিজেও কোন
না কোন ভাবে তার অংশীদার— এই কথা ভাবলেও একটু রোমাঞ্চ হয়। জিয়া
যদি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয় তাহলে সেও হবে একজন যোদ্ধা, সেই রকম একজন
যোদ্ধাকে সুকুমার নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে! অথচ, সুকুমার দ্বিধা করছিল,
শ্যালিকা, শান্তাভীর কথা ভেবে সে দ্বিধা করছিল। দূর ছাই, বাই হোক না কেন,
জিয়াকে সে কিছুতেই চলে যেতে বলতে পারবে না!

বাঙ্গালীরা জোড়ের পাশ দিয়ে আসতে আসতে ভেতরের রিকিউজি মলোনিটার
দিকে তর্র চোখ পড়ল। তার ডুল দুটা একটু কঁচকে গেল। এই রিকিউজিগুলোকে
এখনো অন্য কোথাও সরানো গেল না। লেকের এই দিকটা কেমন নোংরা হয়ে
আছে।

তারপরই একটু হাসি গেল সুকুমারের। স্বাধীনতার পর এতগুলো বছর কেটে
গেল, তবু এই লোকগুলিকে এখনো রিকিউজি বলা হয়। আজ পর্যন্ত এদের
একটা নতুনজনক নামও জুটল না। সে নিজেও তো এরকম রিকিউজি হতে
পারত— নেহাৎ তার বাবা সেই সময় একটা চাকরি পেয়েছিলেন, তাই স্বপ্ন!

এখন দাদা আসছে, তারাও রিকিউজি। এক আশঙ্কন নয়, এক কোটি?

সুখেখা আর তার মাকে ছাড়া স্টেশন থেকে আনতে গিয়েছিল সুকুমার।
ফেরার সময় ট্যাক্সিতে উঠেও সে বলতে পারল না যে তাদের বাড়িতে এখন
অন্য একটি ছেলে থাকে। সুখেখার মা বিনতা দেবীর বেশ রাশতরি চেহারা,
লালপেড়ে একটা গরদের শাড়ি পরে আছেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মায়ার স্বাস্থ্যের খবর
নিজেন। সুকুমার সংযমের উপর দিয়ে যাচ্ছে।

সুখেখা হঠাৎ বলল, সুকুমারদা, আপনাকে এত গভীর মনে হচ্ছে কেন?

সুকুমার চমকে উঠে বলল, কই না তো?

সুখেখা বলল, হ্যাঁ, দেখছি যেন কী রকম একটু অনামনস্ত। কাল কি রাতিরে
মুম টুম হয়নি নাকি? হিমির শরীর কী রকম আছে ঠিক করে বলুন তো!

—দাদা? মায়া খুব ভাল আছে— এই তো আসবার সময় দেখে এলাম
তোমাদের জন্য রান্না করছে!

সুলেখার মা বললেন, সে আবার এই শরীর নিয়ে রাস্তায় গেল কেন?

বাড়িতে এসে কিছু সুলেখা তার তাঁর মা মাকে দেখে নিশ্চিন্ত হলেন। মায়ার চোখ-মুখে সামান্য একটু সোলা-ফোলা ভাব আছে, কিন্তু ক্লান্তির কোনো চিহ্ন নেই। সদা রাস্তায় থেকে বেরিয়ে এসেছে, আগুনের অঁচে তার মুখে একটা লালচে আভা পড়েছে।

মা মেয়ের সাধ দেখেন। তাই কানপুর থেকে শাড়ি আর কিছু জিনিসপত্র নিয়ে এসেছেন। সুলেখা তখন বাপ ঘরে সেগুলো দেখাতে বসে গেল।

এখন বেশ কিছুক্ষণ মেয়েটি গল্প চলে— সুকুমারের এখানে কোনো ভূমিকা নেই। সুকুমার বলল, আমি একটু ঘুরে আসি—

মায়ী বলল, বেশী দেরি করো না, কিন্তু!

সুকুমার সিঁড়ি নিয়ে নেমে প্রায় একতলায় পৌঁছেছে, এমন সময় শুনতে পেল ওপরের সিঁড়ি দিয়ে চটি পরে কট কট করে নেমে আসছে জিয়া। ডাকছে, বৌদি, বৌদি!

এই ক'দিনে জিয়া অনেক সহজ হয়ে গেছে। মায়ার সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে বেশ। তার কিছু দরকার হল যখন তখন নীচে চলে আসে।

সুকুমার ডাকলো, জিয়ার সঙ্গে প্রথম পরিচয়টা মায়ীই সামলে দিক। সে থাকে নি, ভালই হয়েছে। সে তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

বৌদি বৌদি বলে ডাকতে ডাকতে জিয়া ঢুকে এল ফ্ল্যাটের ভেতরে। সামনের ঘরেই দু'জন অচেনা মহিলাকে দেখে সে থমকে গেল।

মায়ী খুব সহজ ভাবে বলল, এসো জিয়া! তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, আমার মা আর আমার ছোট বোন সুলেখা।

বিনতা দেবী তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় টেনে দিলেন। চোখে বিস্মিত দৃষ্টি।

মায়ী বলল, মা, এ হচ্ছে, জিয়া। ওপরে নিজনের ঘরে থাকে। জিয়া হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান— মানে জয় বাংসার লোক, মুক্তিবাহিনীতে ট্রেনিং নিচ্ছে।

জিয়া দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কপালের কাছে এক হাত তুলে বিনীত ভাবে আদাব জানাল।

সুলেখার চোখে বিস্ময়। সত্যি সত্যি মুক্তিবাহিনীর লোক! প্রত্যেক দিন খবরের কাগজে ঘাদের কথা পড়ছে! দেখে তো মনে হয় একটা বাজা খেলে, এই ছেলে বন্দুক চালায়?

মায়ী বলল, এসো জিয়া, ভেতরে এসে বসো।

জিয়া বলল, না, বৌদি। আমি একটা কাজ করছিলাম। আপনার কাছে লেই আছে?

—লেই? লেই মানে?

—আপনারা লেই বসেন না? কোনো রকম আঠা?

—ও, গঁদ? হ্যাঁ আছে, দিছি।

মায়ী সুকুমারের টেবিল থেকে গঁদের শিশিটা নিতেই জিয়া সেটা নিয়ে আবার অভিবন্দন জানিয়ে চলে গেল।

কিন্তু দেবীর মুখটা অপ্রসন্ন। একটুক্ষণ ঘরের আর সবাই চুপ-চাপ। তারপর তিনি বললেন, ছেলেটি এখানে কতদিন ধরে আছে?

মায়ী বলল, এই তো, বারো-তের দিন হোল।

—কোথায় বাস? এখানেই।

—হ্যাঁ। আর কোথায় থাকে?

—তোকেই রান্না-বান্না সব করতে হয় তো?

—হ্যাঁ, মা। অসুবিধে কিছু হয় না। অবশ্য আমরা রান্নার লোক একটা খুঁজছি, ঠিক পাওয়া যাচ্ছে না।

—সুকুমারের এ কি রকম আকৌল? তোর এখন শরীরের এই অবস্থা, এই সময় বাড়িতে কেউ অতিথি আনে? ঐ ছেলেটি রিকিউজি ক্যাম্প থাকেনি কেন?

মায়ী তার মাকে একটু একটু ভয় করে। মায়ের মেজাজ গরম হয়ে গেলে সহ্য হতো না।

সে মৃদু গলায় বলল, কলকাতায় এ রকম অনেকের বাড়িতেই এখন একজন দু'জন করে অতিথি রাখা হয়েছে।

সুলেখা বলল, মা, রিকিউজি ক্যাম্প তো শিশু, বুড়ো আর মেয়েরা আছে। যারা বন্ধ করবে, তারা ক্যাম্প থাকলে কি চলে?

—লোকের বাড়িতে থেকে আবার কী রকম যুক্ত বাসু? সে তো আমি বুঝি না।

করা ঘোরার জন্য মায়ী বলল, ইস, এই শাড়ির পাড়টা কী চমৎকার। এর তো অনেক দাম, মা!

সুলেখা বলল, না, মিনি, এটা বেশ সস্তায় পাওয়া গেছে!

সুকুমার কিরলো একটু বেশী রাত করে। মনে মনে আশংকা ছিল শাওড়ী, নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে একটা ঝড় তুলে ফেলেছেন। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় মনে হল, নব শান্ত। বড় বেশী শান্ত? তার মানে তো ঝড় এখনো শুরু হয়নি।

দরজা খুলে দিল সুলেখা।

সুকুমারকে দেখেই ফিস-ফিস করে বলল, দিদির বাবা উঠেছে।

সঙ্গে সঙ্গে সুকুমার ব্যস্ত হয়ে উঠল। হ্যাঁ? তা হলে তো নার্সিং ছোমে... পাড়ার একটা ট্যাঙ্কিতে বলে রাখা আছে... কতক্ষণ থেকে ব্যথা?

সুকুমার ছুটে চলে এলো শোবার ঘরে। মায়ী সেখান থেকে শুয়ে আছে, মাথার কাছে তার মা।

সুকুমার বলল, খুব বাধা! টাক্সি ভাঙতে পাঠাবো?

মায়ী চোখ মেলে বলল, না। কমে গেছে।

সুকুমার বলল, তা হলেও... এখন থেকেই ভর্তি হয়ে থাকলে ভাল... পরে বেশী বেশী বাধা উঠলে যদি যেতে অসুবিধে হয়।

মায়ী বলল, না, তার দরকার নেই... আমি যুক্তিতে পেরেছি, এটা সে রকম বাধা নয়।

—তবু একবার ডাক্তারবাড়িতে ডাকবো?

—ডাক্তার হয়েছিল, উনি দেখে গেছেন।

বিনতা দেবী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিরতে এত দেবি করলে কেন?

সুকুমার লজ্জিতভাবে বলল, এক বছর বাড়িতে আটকে গিয়েছিলাম—

—এখন করেবটা দিন একটা ভাতাতাড়ি ফিরো—কখন কি হয়।

—ঠ্যা...মানে...হিসেব অব্যাহী আরও তো দশ বারোদিন দেবী হবার কথা।

—মানুষের জন্ম কি আর হত হিসেব মিলিয়ে হয়?

মায়ী বলল, তুমি থেমে নাও! সুলেখা তোমার বাবার দ্বিগুণ দেবে।

হাত-মুখ ধুয়ে সুকুমার এনে বাবার টেবিলে বসল। শুধু তার একটা খাবার কিয়েছে সুলেখা।

একটু ইতস্তত করে সুকুমার জিজ্ঞেস করল, তোমরা সবাই খেয়ে নিচ্ছে।

সুলেখা বলল, ঠ্যা, আমি আর মা তো এই একটু আগে খেয়ে নিজাম—
আপনার জন্য অপেক্ষা করে চলে...মা'র তো গ্যাসটিক আছে, বেশী রক্তিরে খেলে হজমই হয় না—দিকি তো আজ কিছুই খেল না, শুধু এক কাপ গরম দুধ।

সুকুমার ভাত ভেঙে খোল দিয়ে মাখতে লাগল। তার মনের মধ্যে একটা অশ্রুতি।
জিয়া কি খেয়েছে? বাখার জন্ম মায়ী হঠাৎ জিয়ার কথা ভুলে গেছে...এরা দু'জন কি মনে করে তাকে খেতে ভেবেছিল?

একটু বাদেই সে জিজ্ঞেস করল, ওপরে যে ছেলেটি থাকে, সে খেয়েছে?

সুলেখা বলল, হ্যাঁ। তার বাবার তো নন্দুকে দিয়ে ওপরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সুকুমার আবার একটা আঘাত পেলে। ওপরে বাবার পাঠানো হয়েছে? জিয়া নিশ্চয়ই অসুস্থ হয়ে যাবে। ঠগ পাবে। এ পর্যন্ত প্রত্যেকদিন তো সে ওদের সঙ্গে খাবারের টেবিলে বসেই খেয়েছে। বাড়ির ছেলের মতন। আজ সে ভাববে যে, তাকে দূরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এমন কি সে যদি ভাবে যে হিন্দুদের ছোঁয়াছুঁয়ির রোগ...

সুকুমার প্রথমে সফলের ওপর বিরক্ত বোধ করল, তারপরে আবার নিজেই

নিজেকে যুক্তি দিয়ে বোঝাল, আজ মামা অসুস্থ, সুকুমার বাড়িতে ছিল না—সুলেখা আর তার মা নতুন এসেছে—তারা যদি একটি অচেনা ছেলেকে নিজের খাবার টেবিলে না ডাকে, সেটা নিশ্চয়ই খুব দোষের নয়। জিয়া নিশ্চয়ই এটুকু বুঝবে।

—সুকুমারনা, আপনি আর একটু ভাত নেবেন না?

—না, হয়ে গেছে খাওয়া। ঐ ছেলের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে, সুলেখা?

—এই একটুখানি। বেশী কথা হয় নি।

—করা বলে দেখো, বেশ ভাল ছেলে।

—সুকুমারনা আমাকে একদিন বর্তাবে নিয়ে যাবেন?

—কেন? সেখানে গিয়ে কী করবে?

—একটু যুক্ত দেখব।

—বর্তাবে গেলেই বুদ্ধি বৃদ্ধি দেখা যায়?

—বাঃ, প্রায়ই তো মোলাওলি এসে পড়ে, কাগজে দেখেছি।

—ত এসে পড়ে—কিন্তু সেখানটায় তো যেতে দেবে না—করেকজন গ্রামের লোক এই রকম ভাবে মারাও গেছে।

—ত হোক, তবু আমি যাব।

—আজ্ঞা দেখি, যদি সুবিধে হয়।

মেয়েরা তিনজন বড় ঘরটাতে এক সঙ্গে শোবে। বাবার ঘরেই সুকুমারের জন্য বিছানা পাতা হয়েছে। খেয়ে উঠে সুকুমার বিছানার বসল, সুলেখা বসল চেয়ারে। সে একটু গল্প করতে চায়।

সুলেখা বলল, আপনার এ-ঘরে শুতে নিশ্চয়ই কষ্ট হবে।

সুকুমার বলল, তা একটু হলেই বা কি! কলকাতা শহরে আরও কত লোক এম চেয়েও বেশী কম জামগা নিয়ে থাকে।

একটু থেমে, সুকুমার দুটোখানি হাসি তেঁসে বলল, আমার অবশ্য কোন কষ্টই হত না, যদি তুমিও আমার সঙ্গে এই বিছানায় ঘুমোতে। আসবে নাকি?

—এই অসভ্য!

—সত্যিই, তোমার মা যদি না আসতেন, তাহলে আমি সেই ব্যবস্থা...শালীকা মানে তো অশ্রমিক স্ত্রী।

—ইন, খুব শব্দ।

—ত সুলেখা, এবার তোমার জন্য একটা ফুটফুটে বর জোপাড় করতে হয়—তোমার মা বলছিলেন।

—মোটাই কিছু হল নি আপনাকে। আমি এম. এ. পড়ব।

—তোমার মামার জন্ম, এম. এ. পড়তে গিয়ে যদি আবার প্রেমে পড়ে যাও—
পাশের দা থেকে বিনতা দেবী সুলেখাকে ডাকলেন। সুকুমার আর সুলেখা দু'জনেই

উঠে গেল। মায়াকে এখন ওমুখ খাওয়ার কথা। মারা এতই মধো গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার মুখখানা শান্ত। বাপার চিহ্নমাত্র নেই।

৫

সকলবেলা সুকুমার অফিসে বাবার আগেই জিয়া জামাকাপড় পরে বেকবাব জন্য তৈরি হয়ে নীচে নেমে এল। ফ্র্যাণ্টের দরজার কাছ থেকে ডেকে বলল, সুকুমারদা একটু শুনবেন।

সুকুমার খবরের কাগজ পড়ছিল, সেটা হাতে নিয়েই উঠে এল। জিয়া জিজ্ঞেস করল, বৌদি কেমন আছেন?

—ভাল, বেশ ভাল আছেন।

—আমাকে আজ একটু বসিরহাট যেতে হবে। একটা নতুন ট্রেনিং প্রোগ্রাম আছে।

—বসিরহাট? তুমি ঠিক বাস টাস চিনে যেতে পারবে? শ্যামবাজার থেকে বাসে উঠতে হবে।

—শ্যামবাজারে আতা, শহীদ, জয়নুলরা অপেক্ষা করবে আমার জন্য। সুকুমারদা, আমাকে দুটা টাকা দিতে হবে।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!

সুকুমার পাঞ্জাবীর পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা পাঁচ টাকার নোট বাস করল।

—এটা নিয়ে যাও।

—উহু, আমার দু'টাকা দরকার। গাড়ি ভাড়া।

—আরে, এটা নিয়ে যাও না!

—না, আমি বেশী নিয়ে কি করব?

—রেখে দাও না, যদি লাগে। তা ছাড়া দুপুরে খাবে কোথায়?

—ক্যাম্পে খাবার ব্যবস্থা থাকবে। আমাকে দু'টাকাই দিল।

—খুচরো নেই। রাখো না এটা।

সুকুমার জোয় করে পাঁচ টাকার নোটটা জিয়ার পকেটে ভরে দিল। জিয়া সেটা নিয়ে চটপট করে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

একটু বাদেই ঘিরে এল আবার। মোড়ের পাশের দোকানটা থেকে টাকটা জড়িয়ে এনেছে। সুকুমারকে তিন টাকা ফেরত দিতে বলল, আমার এর বেশী লাগবে না।

—আজ্ঞা পাগল ছেলে তো! টাকা সঙ্গে রাখলে কী কতি হত।

—লাগলে তো নিতামই। আপনর কাছ থেকে তো অনেক কিছুই নিচ্ছি।

সুকুমার জিয়ার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। জিয়ার গলার আওয়াজে কি খনিকটা শোভা কুটে উঠেছে? সত্যিই তার ট্রেনিং আছে, না ইচ্ছা করে চলে গেল। অল রাত্তিরের ব্যাপারে কি অপমানিত বোধ করেছে? এই সব কথা তো মুখ ঘুটে জিজ্ঞেস করাও যায় না। ছেলেটা আজ ঘিরবে কিনা সে কথাও তো বলে গের না।

সুকুমার যেহেতু ফিরেই দেখতে পেল বিনজা বেবীকে। তিনি টাকা দেওয়ার ব্যাপারটা দেখেছেন।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ছেলেটা এখানে কতদিন থাকবে?

সুকুমার খবরের কাগজের দিকে চোখ রেখে গভীর ভাবে বলল, ঠিক নেই!

—একে বুঝি মাঝে মাঝেই এরকম টাকা দিতে হয়?

—না। এই কখনো কখনো এক টাকা দু'টাকা—

—আমার মামাদের মস্ত জমিদারি ছিল মৈমনসিং-এ। সব তো ওরাই নিয়েছে।

—কে নিয়েছে? এই ছেলেটি? কিংবা এরই আত্মীয়স্বজন!

—তা কি আমি জেনে বলে আছি! তবে ঐ ওরাই তো।

সুকুমার আর কাগজ থেকে মুখ তুলে ধীরে সুস্থে বলল, মা, ইতিহাস বারবার বললার! পুরোনো কথা আঁকড়ে ধরে বসে থাকলে কি চলে, এদিকে ওদিকে অনেক অবিচারই হয়েছে এক সময়—

মায়া ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, জিয়া বেরিয়ে গেল? দুপুরে খাবে না?

সুকুমার বলল, ট্রেনিং-এ গেল— ক্যাম্পে খেয়ে নেবে!

—আমার সঙ্গে দেখা করে গেল না?

—ও বোধ হয় ভেবেছে, তুমি শুয়ে আছ।

—বোজই তো দেখা করে যায়।

বিনজা দাঁড়ী বললেন, ও কি শোবার ধরেও ঢেকে নাকি?

—হ্যাঁ। ওতো বাড়ির ছেলের মতন।

—দেখিস বাপু! তাদের বড় বাড়িবাড়ি! জানা নেই, শোনা নেই, সুলেখা একটা ছোট থাক দিয়ে বলল, মা, তুমি ছুপ করো তো! তুমি বড় পুরোনো পত্নী! আজ্ঞা সুকুমারদা, ওরা কি রাইফেল নিয়ে ট্রেনিং নেয়?

—হ্যাঁ। জিয়া তো থ্রি নট থ্রি রাইফেল চালাতে শিখে গেছে! এখন মর্টার চালাবে শিখছে।

—ইস, আমাকে একটু দেখতে দেবে না? এসব শুধু সিনেমায় দেখেছি, নিজের চোখে দেখি একবার।

—ওখানে মেয়েদের যাওয়া নিষেধ।

—কেন, মেয়েরা বুঝি বুদ্ধ করতে পারে না?

—নিশ্চয়ই পারে। গৃহযুদ্ধে তো মেয়েরা দারুণ ওস্তাদ। তোমার দিদি পর্যন্ত এমন গৃহযুদ্ধ করে।

মায়া বলল, আহা!

সুলেখা হেসে উঠল।

সেদিন অফিসে সুকুমারদের ঘাইনের দিন। ঠিক হয়েছিল, সেই মাসে সকলেই একদিনের ঘাইনে রিকিউজি ফণ্ডে চাঁদা দেবে। সুকুমার নিজেই উদ্যোগী হয়ে সবাইকে বুঝিয়ে এই ব্যবস্থা করেছিল।

অফিসের মালিক তাঁর ব্যাপারে গভর্নমেন্টকে ঠিকিয়ে প্রচুর লাভ করছে। সুকুমার চায় সেই পাপ যেন তাদের স্পর্শ না করে। তাই তারা কিছুটা আত্মত্যাগ করে প্রানিমুক্ত হতে চায়। অফিসের মালিকের একলাখ দু'লাখ টাকাতে কিছুই ব্যয় আসে না। কিন্তু মহাবিপদ পরিবারে ফুড়ি, পঁচিশ টাকা কম পড়লেই গায়ে লাগে। তবু সুকুমার আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করল, অফিসের একজন কর্মীও এই টাকাটা চাঁদা দিতে একটুও আপত্তি করল না।

চাঁদা উঠল প্রায় সাত হাজার টাকা। প্রথমে ঠিক হয়েছিল, টাকাটা গভর্নরস রিকিউজি ঘাণ্ডে দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু সেটা বড় নৈর্ব্যক্তিক ব্যাপার। ইউনিয়নের অজয়বাবু বললেন, তার চেয়ে ঐ টাকার কোন ভিনিসপত্র কিনে সমালমি রিকিউজিদের কাছে পৌঁছে দিলেই তো হয়। সকলেই তাতে সম্মত হোল। ও টাকায় কাপড় কিনে বিলি করা হবে। অফিসের কয়েকজন লোক নিজের হাতে বিয়ে আসবে।

সুকুমার মনে মনে ঠিক করল, যেদিন বর্তরে ঐ কাপড় নিয়ে যাওয়া হবে, সেদিন সুলেখাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে। ওর যখন এত সখ বড়ার দেখার।

অফিস থেকে সুকুমার দু'হাজার টাকা খুঁপ চেয়ে দরখাস্ত করেছে। মাঝাকে নার্সিং হোমে রাখার একটু বড় খরচা আছে। তা হাড়া বাড়িতে লোকজন বেড়ে যাওয়ার খরচ বেশ বাড়বেই। সুকুমারের একটা পরামা জমা নেই কোথাও।

সুকুমারের হঠাৎ মনে হল, আজ যদি হঠাৎ সে গাড়ি চাপা পড়ে মারা যায়, তাহলে মাঝাদের কী হবে? কী আবার হবে, পথে বসবে! উপায় কী! বা দিনকাল, সংপথে থেকে কাজের পরামা জমাবার উপায় নেই। মারা অসংপথে যায় না, তারা অনেকেই আসলে সে পথে যাবার সুযোগ পায় না, কিংবা সুসুক সম্মান জানে না!

সুকুমারের বাড়িতে টেলিফোন নেই। পাগের বাড়িতে বলা আছে যে দুপুরের দিকে যদি মাঝার হঠাৎ কথা ওঠে, তবে যেন সুকুমারকে সঙ্গে সঙ্গে অফিসে খবর দেওয়া হয়।

সুকুমার নিজের টেবিলের টেলিফোনটার দিকে মাঝে মাঝে এক দৃষ্টি তাকিয়ে

থাকে। কখনো বেজে উঠলেই চমকে ওঠে। কিন্তু বাড়ির টেলিফোন আসে না। এক এক সময় তার ভারি অন্তত লাগে যে আর কয়েকদিনের মধ্যেই সে বাবা হয়ে যাবে। পরকণেই তার মনে হয়, মাঝাকে কত কষ্ট সহ্য করতে হবে এই কটা দিন। বাবা হওয়া নিশ্চয়ই আনন্দের, কিন্তু সবটুকু কষ্ট সহ্য করতে হয় মাকে। মাঝার যদি কিছু একটা হয়ে যায়? অনেকে তো সম্মান জন্মের সময়—না, না, তা হতেই পারে না! মাঝার কথা মনে হলেই সুকুমারের মনটা শুধু ভাবাবাসা নয়, এক ধরনের স্নেহও ভরে যায়। এত ভালো মেয়ে!

সুকুমার আবার ভাবল, তাদের সম্মানের জন্মের কথা ভেবে সে এবং মায়া যতখানি ব্যাকুল, ঠিক তেমনি বাংলাদেশের ঠিকঠাক জন্ম হবে কিনা সে জানা ওখানকার সবলের নিশ্চয়ই ব্যাকুলতা, উত্তেজনা আরও অনেক বেশী।

সন্ধ্যার পর সুকুমার বসবার ঘরে সুলেখার সঙ্গে বসে আড্ডা দিচ্ছিল। মায়া আজ বেশ ভাল আছে। তিন কাপ চা খাওয়া হয়ে গেছে, সুকুমার আরও এক কাপ চা খাবে কিনা ভাবছে—এমন সময় জিয়া ফিরল। তার চোখ মুখ উত্তেজনায় লাল।

সে সোজা বসবার ঘরে ঢুক এসে বলল, সুকুমারদা, আজ দারুণ খবর আছে!

সুকুমার বলল, কী হয়েছে? অত হাঁপাচ্ছে কেন? বসো! বসে বসে বল!

জিয়া ধপাস করে বসে পড়ে বলল, আমার বড় ভাই, মার কথা আপনাদের বলেছিলাম—তার খবর পাওয়া গেছে!

—তাই নাকি? কোথায়?

—আজই বড়ারের ওপাশ থেকে একজন এসেছে, সে নিজের চোখে দেখেছে। কথাও বলেছে।

—হাঃ! দারুণ খবর।

সুলেখা জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছিল আপনার দাদার?

জিয়া সুলেখার দিকে এক পলক তাকিয়েই আবার চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, উনি ২৭শে মার্চ বানসেনাদের হাতে ধরা পড়েছিলেন। তারপর ওনাকে যশোর কার্টনমেস্টে আটকে রাখা হয়েছিল, সেখান থেকে গত মাসে পালিয়ে এসেছেন আরও কয়েকজনের সঙ্গে। এখন উনি বাগেরহাটে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার... বাগেরহাট কোথায় জানেন?

সুকুমার বললো, হ্যাঁ, খুলনায় না?

—হামি যাবো! সুকুমারদা, আমিও যাবো।

—কোথায়?

—বাগেরহাটে। আমার বড় ভাইয়ের পাশে গিয়ে লড়াই করবো!

—হুমি যেতে পারবো? এখন বড়ার পার হতে পারবে?

আমি ঠিক চলে যাবো। আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না। আজই শুনলাম, আমাদের দুটি ছেলে ঢাকা পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এসেছে, কেউ তাদের ধরতে পারে নি। তারা ঢাকার মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করে এসেছে। আমাকে ওরা বলেছিল চিঠিগাছের দিকে পঠাবে—আমি না করে এসেছি। আমি খুলনায় যাবো!

—বেশ ভালো, তোমার নামের কাছাকাছি যাওয়াই ভাল মনে হয়। কবে যাবে?

—আর দু'চারদিন সবুর করতে হবে! বড়রৈ এখন ওরা হেভি প্যারামোনিং শুরু করেছে। আজ তো তিন-চারবার ফারারিং এক্সচেঞ্জ হয়েছে!

সুলেখা উত্তেজিত ভাবে জিজ্ঞেস করল, তাই নাকি? আপনি দেখতে পেলেন?

—আওয়াজ শুনেছি! একটা মটরের শেল এসে নদীতে পড়ল—কী বিরাট ভাবে জলটা লাফিয়ে উঠল তখন—আমরা সাঁতারে গিয়ে পরে শেলটা উদ্ধার করেছি—চাইনিজ মার্কা দেখে—

সুকুমার বলল, এবারে যুদ্ধটা লাগবেই মনে হচ্ছে। ওদিককার আর কিছু খবর পেলেন?

—কিছু খবরও বরং আছে। সাতক্ষীরা টাউনের অনেকগুলো বাড়ি আর কয়েকটা পাহার খলসেনাবা আওল আলিয়ে দিয়েছে!

সুলেখা বলল, ইস, শুধু শুধু নিজের দেশের লোককে ওরা এরকম ভাবে মারে?

জিয়া বলল, ওরা এখন কাউকে, মানে, কারকে বিশ্বাস করে না!

—গোটা পূর্ব বাংলার লোককে অবিশ্বাস করলে ওরা রাজত্ব করবে কাদের নিয়ে?

সুকুমার বলল, সব লোকই কি আর ওদের বিপক্ষে। কিছু লোক নিশ্চয়ই এখনো পাকিস্তানের সাপোর্টের।

জিয়া বলল, এখন আর কেউ নেই! বাংলাদেশের প্রগে সবাই এখন এক হয়ে গেছে!

সুকুমার বলল, তা যদি হয়, তাহলে তো ভালই। কিন্তু ভাষার চেয়েও বর্ষ আর অর্থনীতির ওপর নিশ্চয়ই অনেক বড়। অনেক লোক এখন ঘাপটি মেয়ে আছে, পরে মাথা তুলবে।

জিয়া জোর দিয়ে বলল, না সুকুমারদা, আপনি ভাবেন না! আমাদের দেশের সাড়ে সাতকোটি মানুষের মধ্যে প্রত্যেকই এখন ভাষার জন্য প্রাণ দিতে পারে!

সুকুমার চুপ করে গেল। সে জানে, এটা এক ধরনের ভাবালুতা। একটা প্রবল উচ্ছ্বাস। অবশ্য এই উচ্ছ্বাসকে ঠিক মতন চালিত করতে পারলেও অনেক সময় অনেক বড় কাজ হয়।

জিয়া বলল, চট্টগ্রামের অপারেশনটাও কিন্তু দারুন ছিল। যদি যেতে পারতাম—কিন্তু আমার বড় ভাইয়ের খোঁজ পাওয়ার পর...

সুলেখা বলল, কী হবে চট্টগ্রামে!

—ওখানো সমুদ্র দিয়ে সাঁতারে এসে—

সুকুমার গম্ভীর হয়ে বলল, থাক, ওখানো বলতে হবে না।

জিয়া আর সুলেখা দু'জনেই অস্বস্তি হয়ে গেল। সুলেখা বলল, কেন, বললে কী হয়েছে?

সুকুমার বলল, যুদ্ধের সময় যে কোন অপারেশনই একটা গোপন ব্যাপার। ও সব নিয়ে বেশী আলোচনা করতে নেই।

সুলেখা একটা আহত হয়ে বলল, বাঃ, আমি কারকে বলে দেব নাকি?

—তুমি হয়তো বলবে না।

—হরতো মানে?

—বলছি যে তুমি নিশ্চয়ই বাইরের কারকে বলবে না—কিন্তু নীতিগত ভাবেই এতলো গোপন রাখা উচিত। তাছাড়া ধরো, তুমি স্পাইদের হাতে পড়লে কৌনকমে

—তারা প্রত্যাচার করে তোমার কান থেকে খবরটা বার করে নিতে পারে। কিন্তু তুমি যদি খবরটা না জানো, তা হলে আর কী বার করবে?

—আমি কী করে স্পাইদের হাতে ধরা পড়বো? আমাদের দেশের মধ্যে?

—বাঃ, আমাদের দেশের মধ্যেই বিদেশী স্পাই নেই? সেদিন কী একটা ঘটনা শুনলাম জান?

এরপর গল্প গল্পে রাত বেতে গেল। যেই দশটা বাজল, অমনি সুলেখা দৌড়ে গিয়ে রেডিওটা নিয়ে এল। দেবদুল্লালের খবর শুনতে হবে। এই সময় সারা দেশের অসংখ্য মানুষ রেডিওর সামনে উদ্বীর্ণ হয়ে বসে থাকে।

—কী বলছেন?

জিয়া ঢেকে উঠল। এগারোটা বাজে। সুকুমার অধিসে চলে গেছে। মায়া শুয়ে আছে। বিবতা দেবী স্নান করে পূজোয় বসেছেন। সুলেখার কিছুই করার নেই। বই পড়তে আর ভাল লাগছিল না, সে ওপরে উঠে এল জিয়ার সঙ্গে গল্প করার জন্য।

জিয়া বেঁচিলের সাহনের চেয়ারে বসে কী খেন লিখছিল একটা খাতায়। সুলেখাকে দেখে আড়তাড়ি খাতাটা লুকিয়ে কেঁদল।

সুলেখাসেটা লক্ষ্য করে বলল, কিছু লিখছিলেন কী? এশে বিরক্ত করলাম।

জিয়া অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, না, না, ও কিছু না। আপনি বলেন না।
হাত দিয়ে সে একটা টেরার থেকে ধূসো ছুঁছে দিল।
সুলেখার কৌতুহল বেগী। তার চোখ তখনো খাতটার দিকে।
সে আবার বলল, গোপনে কিছু লিখছিলেন, যা আমার দেখা উচিত নয়?
জিয়া এবার হাসল। খাতটা খুলে দিয়ে বলল, গোপন কিছুই না, আপনি
দেখতে পারেন!

একটা কবিতা।

—আপনি কবিতা লেখেন?

—এই একটু একটু!

—এত যুদ্ধ বিগ্রহ, বঙ্গবর্ত্ত, এর মধ্যেও আপনার হাতে কবিতা আসে?

—যে-কোন সময়েই কবিতা লেখা যায়।

—কবিতার প্রতিযোগিতা কলম। আপনাকে তবু এই সময় রাইফেল ধরতে
হবে?

জিয়া একটু ভাবের সঙ্গে বলল, আমার কলমটাই রাইফেল, আমার রাইফেলটাই
কলম!

সুলেখা কবিতাটির ওপর একবার চোখ বোলাল, তারপর বলল, আমি অবশ্য
কবিতা তেমন বুঝি না। সেদিন সুকুমারদা বলছিলেন, সব গোপন কথা আমার
জানা উচিত নয়, তাই আমি ভাবলাম, কোন গোপন ব্যাপার বুঝি দেখে ফেললাম।

জিয়া বলল, ও সেই চট্টগ্রামের অপারেশনটার কথা বলেছেন তো! আপনি
সেটা এখনো মনে করে রেখেছেন?

—কেন মনে রাখব না? কেউ আমাকে অবিশ্বাস করলে আমার খুব রাগ
লাগে।

—না, আসলে সুকুমারদা নিজেই বোধহয় ভয় পাছিলেন। সেই ব্যাপারটা
আসলে কী জানেন? আমাদের কয়েকজন ছেলে, যারা সাঁতার খুব ভালো জানে,
তাঁদের আলাদা করে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছিল। খুব কঠিন ট্রেনিং। সমুদ্রের মধ্যে
প্রায় তিরিশ মাইল সাঁতরাতে হবে— তাও অধিকাংশ সময় জলের নীচে দিয়ে...
এদের বলে ফ্রগ ম্যান।

—সাঁতরে গিরে কী হবে?

—এখন বাংলাদেশের ঘত সাপ্লাই আসছে জাহাজে— সবই আসছে চট্টগ্রাম
পোর্ট দিয়ে। এই সব ফ্রগ ম্যানদের কাজ হবে ঔপ্যটনিক দিগে গোপনে সাঁতরে
গিয়ে চট্টগ্রাম পোর্টের কয়েকটা জাহাজ মাইন দিগে উড়িয়ে দেওয়া। পরপর কয়েকটা
জাহাজ ধ্বংস করে দিলে পারলে পোর্টটাই অচল হয়ে যাবে! আমি তো খুব
ভাল সাঁতার জানি, তাই আমাকে এই ট্রেনিং এর জন্য বাছা হয়েছিল।

—কিন্তু এ কাজ তে দারুণ রিস্ক! যারা যাবে তারা মারাও যেতে পারে!

—তা তো পারেই। কিন্তু দেশের জন্য মরতে কে ভয় পায়? আমি বাইনি
অন্য কারণে।

সুলেখা একটু চুপ করে রইল। তারপর আন্তে আন্তে বলল, আপনি এই গোপন
ব্যাপারটা আমাকে বলে দিলেন কেন?

জিয়া মুখ নীচু করে বলল, তার কারণ আপনাকে কোন ব্যাপারে অবিশ্বাস
করার কথা আমি ভাবতেই পারি না!

এই সময় নীচ থেকে বিনতা দেবীর ডাক শোনা গেল, সুলেখা! সুলেখা!
সুলেখা চোঁচিয়ে উঠল দিল, যাচ্ছি!

তারপর জিয়াকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো! এই যে
যুদ্ধটা হচ্ছে, এতে আমি কোন সাহায্য করতে পারি না? আমি তো শুধু শুধু
বাড়িতেই বসে আছি—

জিয়া বলল, না, আপনি আর কী করবেন?

—কেন, কত বইতে পড়েছি, যুদ্ধের সময় মেয়েমাও অনেক কিছু করে—
এমনকি নার্সিং।

—না, আপনারা শুধু শুধু কষ্ট করতে যাবেন কেন! এটা আমাদের দেশের
ব্যাপার—আমাদেরই লড়াই করতে হবে, মরতে হবে।

—ও এটা আপনারা যুদ্ধ? আমাদের কিছুই নয়? তবে আমরাও কেন
এত উত্তেজিত হয়ে উঠি? কেন মনে হয়, আমরাও সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

—সেটা আমাদের সৌভাগ্য। আমাদের মধ্যেও তো এখন হাজারে হাজারে
ছেলে এগিয়ে আসছে লড়াই করার জন্য। কিন্তু সকলকে দেবার মতন অস্ত্রও
তো আমাদের নেই। তাছাড়া, এই কথাটা আমার আগেই বলা উচিত ছিল—
আপনারা তো এই যুদ্ধে অনেক কিছু করছেন।

—কি?

—আমরা যারা যুদ্ধ করছি, তাদের সাহায্য করছেন?

—আমি আবার কি সাহায্য করছি? ছাই করছি!

নীচ থেকে আবার বিনতা দেবীর ডাক শোনা গেল।

সুলেখা এবার খানিকটা বিরক্ত ভাবে বলল, যাচ্ছি! যাচ্ছি তো বললাম।

তারপর জিয়ার দিকে ফিরেই বলল, আমি আপনাদের কিছুই সাহায্য করি
নি।

তবে যদি কখন কোনরকম সাহায্য করা আমার দ্বারা সম্ভব হয়, জানাবেন!

তারপর সুলেখা তরতর করে নীচে নেমে এল।

বিনতা দেবী দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। কক্ষ গলায় জিজ্ঞেস করলেন,
ওপরে কী করছিলি?

সুলেখা খানিকটা অজ্ঞানতার সঙ্গে বলল, এই জিয়ার সঙ্গে কথা বলছিলাম।

—আমি তখন থেকে ডাকছি, কানে শুনতে পাশ না?

—সাদা কিছুই ছিল তো!

—শুধু সাদা ছিলেই হল? আসবার নাম নেই! ওর সঙ্গে তোমার এত গল্প কিসের?

—অনেক গল্প আছে। ওরা কতরকম বিপদের কথা নিয়ে এসেছে।

—দাখ খুব, আমি অত আশিষ্টা পছন্দ করি না। তোরা সবাই মিলে কী আরম্ভ করেছিস?

—কিছু না তো! অনেক কিছুই করার ছিল, কিন্তু কিছুই তো করি নি।

—বব্বার, আর এক একা ওপরে যাবি না।

—কেন, ওর সঙ্গে কথা বলার তোমার এত আগ্রহ কেন?

—আমি বলছি যাবি না!

মায়া বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে। উদ্ভিন্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে?

সুলেখা বলল, কিছু হয়নি তো! নিদি, তুমি আবার উঠে এলে কেন?

সুলেখা আলনা থেকে তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে ঢুক গেল।

বিনতা দেবী বললেন, দাখ, ঐ ছেলেটার সঙ্গে খুবের এত ঘোশা-মেশি আমি পছন্দ করি না। এসব মেটেই ভালো নয়।

মায়া বললো, মা, আস্তে, একটু অস্ত্রে কথা বলা।

—কেন! আস্তে কথা বলবো কেন? নিজাদের বাড়িতে বসে সত্যি কথা বলতেও ভয় পাবো? তোরা ছেলে মানুষ, কিছু বুঝিস না।

—ঠিক আছে, আমি খুবকে বলবো যেন জিয়ার সঙ্গে বেশী মেলামেশা না করে। কিন্তু তুমি যেন জিয়াকে কিছু বলতে যেও না!

বিনতা দেবী তবুও মৃদু গোমড়া করে বসে পড়লেন।

সুকুমার অকসেসে বসে বসে একটা ছুটির দরখাস্ত লিখল। আগামীকাল থেকেই সে সাতদিনের ছুটি নেবে। ছুটি অনেক পাওনা আছে। বিনতা দেবী যোজাই ছুটি নেবার কথা বলছেন। মায়ার যদি ছটা দুপুরের দিকে বাখা ওঠে তখন ওরা খুব বিপদে পড়বেন। সুকুমারকে টেলিফোন করা হবে, তারপর সুকুমার আসবে—তাতে যদি অনেক দেবী হয়ে যায়? তিনি আর সুলেখা কলকাতায় নতুন—এখানকার হালচাল অত বেশী খোঁখো না।

অফিসের মালিক আজ নেই, তিনি একটা তদ্বিমে গেছেন দিল্লীতে। তাঁর ভাইপো মদনলালই এখন অফিসের উপনায়ক।

সুকুমার দরখাস্তখানা নিয়ে মদনলালের ঘরে ঢুকল। মদনলাল তার কাবার মতন সুস্থির নয়। দরখাস্তখানা দেখেই প্রায় জাফিয়ে উঠল—‘আরে বাপ রে বাপ!’

ছুটি! এই টাইম যে ছুটি! আভি ইতনা টেণ্ডার, এখন আপনি ছুটি লিবেন! আপনি কি বলবেন সুকুমারবাবু! কেন ছুটি লিবেন কেন?’

যদি ছুটি নেবার কারণটা দরখাস্তে লেখা আছে, তবু সেটা মুখে বলতে লজ্জা পেল সুকুমার। তার সম্ভান হবে, একখাটা ঘেন চট করে মুখ দিয়ে বেরোর না। মদনলাল পুরো দরখাস্তটা পড়বেও না।

সুকুমার বলল, মদনলালদী, আমি গত বছরে একবারও একদিনের বেশী ছুটি নিইনি।

মদনলাল বলল, লিবেন, যত খুশী লিবেন—আপন এই হাঙ্গামটা মিটে যাক। আরে শালা, লড়াইটা লাগবে লাগবে করে যে কিছুতেই লাগে না! একিকে গ্ল্যাফআউট শুরু হয়ে গেল। লড়াইয়ের সময়ই তো আসল কাম হবে। এখনই তো সাপ্লাইয়ের মওকা। কাকা বলেছেন, আপনাদের সবাইকে বোনাস লিবেন, ডবল ডবল।

সুকুমার বুঝল, তর্ক করে লাভ নেই। বেম্পানি এখন লাভের নেশার উদ্ভত। বেশ এখন ঘটন সমস্যা, লক্ষ লক্ষ মানুষ চরম দুর্ভাগ্যের মধ্যে রয়েছে, আর এটা সেই সময় কত বেশী লাভ করা যায় সেই স্বপ্ন দেখেছে। সে যাই হোক, সে তে আর এদের আটকাতে পারবে না। সে চাকরি করতে এসেছে, চাকরি ছাড়লে তার সব কিছু বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। বিশেষত তার প্রথম সম্ভান জন্ম নিতে যাচ্ছে!

সে একটু কঠোরভাবে বলল, আমার উপায় নেই মদনলালদী। দরখাস্তটা পড়লেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। কান থেকে আমি আসব না। আপনার কাবার সঙ্গে আমার কথা হয় আছে।

মদনলাল কাগজটার দিকে চোখ রাখল। তারপর জিজ্ঞেস করল, ছুটির সময় আপনি কলকাতাতেই থাকবেন তো? নাকি, বাইরে যাবেন!

সুকুমারের হাসি পেল। তার দ্বীপ সম্ভান হবে কলকাতায়, আর সে কি এই সময় বাইরে বেড়াতে যাবে নাকি? এদের মাথায় কিছু নেই। তবু বলল, কলকাতাতেই থাকব।

—ঠিক আছে। খুব জরুরি ছিল আপনাকে বাড়িতে খবর পাঠাব। এসে একটু দেখে দিয়ে যাবেন। আর আজ আপনি বেশীক্ষণ থেকে আপনার সব কাজ অবোদনারায়ণকে বুঝিয়ে দিয়ে যান। তাড়াতাড়ি পালানো না, অবোদনারায়ণের কাজ বুঝতে সময় লাগে—আমি আপনাকে ওডার-টাইম দিব—

অজ যে বেশীক্ষণ থাকতে হবে, তা সুকুমার ধরেই নিয়েছিল। টেলিফনের সব কাজ পরিষ্কার না করে ছুটি নেওয়া তার স্বভাব নয়। অনেকগুলো চিঠির ড্রাইফট করে দিয়ে যেতে হবে। অবোদনারায়ণকে সমস্ত প্রোগ্রামটা ছকে দিয়ে যেতে হবে।

পাঁচটার পর অফিসের সাত আট জন রয়ে গেল। এর মধ্যে কয়েক জন আছে,

সারাদিন তারা কোন কাজই করে নি, হঠাৎ দুটির অংশে কিছু জরুরি কাজের কথা তাদের মনে পড়ে যায়। মালিককে দেখতেই মালিক সেই কাজ শেষ করে দিয়ে যেতে বলে। অর্থাৎ ওজবটাইমের লোভ। সকাল ন'টা থেকে রাত ন'টা এরা অফিসেই কাটিয়ে দেয়। কীভাবে যেন আর কিছুই করার নেই এদের।

বেয়ারাকে দিয়ে কফুরি-তরকারি আর চা আনিতে খেয়ে নিল সুকুমার। তারপর কাজে বসে গেল। এদিকে ওদিকে দু'চার জন মাঝে মাঝেই কাজ খামিরে ওলটানিতে মেতে ওঠে—সেনিকে মন নেই সুকুমারের। দেশ এখন একটা বিরাট কাণ্ড চলছে, এক কোটির মতন রেকর্ডজি বীমাভুক্ত জুড়ে তাঁর নীচে হুঁকছে। বাংলাদেশের ভাগ্য নিয়ে সারা পৃথিবীতে ছিনিমিনি খেলা চলছে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী পৃথিবীর দৃষ্টিশালী দেশগুলিতে ঘুরে ঘুরে বাংলাদেশের সংকট মীমাংসার জন্য সাহায্য চেয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন, তবু এরা এখানে বসে কী একটা সিনেমার গল্প নিয়ে হাসাহাসি করছে? এটা অসহ্য লাগে সুকুমারের। কিন্তু আপত্তি জানিয়ে লাভ নেই। সে কিছু বলতে গেলেই ওরা বলবে, আপনার তো ঐ দেশে বাড়ি ছিল। ওরা আপনার জাতভাই, তাই আপনার বেশী বেশী দরদ! সুকুমার নিঃশব্দে কাজ করে যেতে লাগলো। সব কাজ তাকে আদ্য শেষ করে দিয়ে যেতেই হবে।

ছোকরা টাইপিস্ট তখন এক সময় বলল, এবার উঠুন সুকুমারদা, রাত যে ন'টা বাজল।

সুকুমার চমকে উঠল। আঁা, ন'টা? বাড়িতে তো আজ বলে আসিনি যে আজ ঘিরতে দেবী হবে। ওরা যদি চিন্তা করে। মারা কেমন আছে? পাশের বাড়িতে টেলিফোন করে খবর নেবার জন্য সুকুমার টেলিফোনটা তুলল। টেলিফোনটা ভেঙে, কোন শব্দই হচ্ছে না। সুকুমারের ফুকের মধ্যে ধক করে উঠল। যদি মায়ার কিছু হয়ে থাকে, ওরা তাহলে কী করে খবর দেবে? হয়তো এতক্ষণে অনেকবার চেষ্টা করেছে...

ঠিক এই সময় অফিসের বারান্দা পরশ ছুটে ছুটে এসে বলল স্যার, যুদ্ধ লেগে গেছে, যুদ্ধ।

সবাই এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে উঠল। কী বললিস? আঁা?

পরশ বলল, নীচের রেডিওতে বলছে—যুদ্ধ লেগে গেছে, পাকিস্তান বোমা ফেলেছে আগ্রা—

সবাই হুড়মুড় করে চলে এল নীচে। পাশের দোকানে রেডিও বাজছে, তার সমানে বিরাট ভীড়। উদাত্ত গলায় সংবাদ পড়া হচ্ছে বেতরে...প্রধানমন্ত্রী আজ সন্ধ্যাবেলাতেও কলকাতায় ছিলেন, হঠাৎ সংবাদ পেয়ে দিল্লী চলে গেছেন—পাকিস্তান অত্যন্ত ভারতের বিভিন্ন বিমান বন্দরে বোমা ফেলেছে—তার উত্তরে ভারতযুদ্ধবোম্বা ফেলেছে—আজ রাত বারোজিমে প্রধানমন্ত্রী নিজে জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণ দেবেন।

পানের দোকানের কালেক্টরে চোখ গেল সুকুমারের। আজ ওরা ডিসেম্বর, ১৯৭১। একটি ঐতিহাসিক দিন।

সুকুমার আর অফিসে ঢুকল না। দ্রুত বাড়ির দিকে পা চালাল। রাস্তাঘাট অন্ধকার ঘুট-ঘুট করছে, হঠাৎ ব্ল্যাক-আউট শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে ঘাচ্ছে কিছু কিছু বাস আর গাড়ি—হেডলাইটের ওপর আলকাতরা লাগানো। মোড়ে মোড়ে মানুষেরা জটলা। কিন্তু কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা নেই। আশ্চর্য, এই ব্ল্যাক-আউটের মহড়ার সময়ও শেখাও একটা চুরি-রাহাজানি-বলাংকারের কথা শোনা যায় নি, কোনো গাড়ির দুখীনা হয়নি। হঠাৎ কি এতবড় দেশটার সব মানুষ দায়িত্বপূর্ণ আর সুশৃঙ্খল হয়ে গেল! যুদ্ধ সবাইকে সজাগ করে দেয়। এরকম অবস্থা সুকুমার আগে কখনো দেখেনি।

ধর্মভীর যোদ্ধা একদল লোক এই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়েই দারুণ তর্কাতর্কি করছে। তাদের মধ্যে একজন সিগারেট ধরাবার জন্য দেশলাই জ্বালতেই সেই আলোতে সুকুমার তাকে চিনতে পারলো। অনুশম!

সে দিয়ে অনুশমের কঁমে হাত রাখতেই অনুশম ফিরে বললো, কে রে? ও, সুকুমার? খবর শুনেছিল?

এ খবর কি সারা কলকাতায় আর করোর জানতে বাকি আছে? সবাই জানে যুদ্ধ বেঁধে গেছে। তবে যুদ্ধের লেটেস্ট খবর হস্তো অনুশম জানতে পারে। খবরের কাগজের লোকদের সঙ্গে অনুশমের যোগাযোগ আছে। পাকিস্তানীরা আগ্রার বোমা ফেলে দিল। আগ্রার অবস্থা কী এখন?

সুকুমার জিজ্ঞাস করলো, আগ্রা ফল করে গেছে?

অনুশম বললো, অত সোজা? আমি এই মাত্র আনন্দবাজার অফিস থেকে খবর নিয়ে এলাম। রিপোর্টাররা কী বললো জানিস? পাকিস্তানীরা হঠাৎ আমাদের কয়েকটি এয়ারবেস আটক করবে। এ খবর আমরা আগেই পেয়ে গিয়েছিলাম। তাই আমাদের সব প্লেনগুলো মাটির তলায় হাঙ্গার তৈরি করে রাখা আছে। আর ওপরে কতগুলো কঠোর তৈরি নকল ড্রামি প্লেন সাজিয়ে রাখা আছে। পাকিস্তানীরা সেগুলোতে ওপর বোমা ফেলে ভাবলো, খুব কবজার!

—তার এমিকার খবর কী? তাকার দিকে?

—যুক্তি বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের আর্মি বড়ার ক্রম করে ঢুকে গেছে। হাশোর সেক্টরে হেভি ফাইটিং হচ্ছে।

কিছুক্ষণ গল্পে যত থাকবার পন সুকুমারের হঠাৎ খেয়াল হলো যে যুদ্ধের উত্তেজনায় সে তাঁর নিজের বাড়ির কথাও ভুলে যাচ্ছে। মায়ার এতক্ষণে কী হয়েছে কে জানে।

সুকুমার বললো, বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। এটা আমাদের জীবনে দেখে যাবো। এটা আমি আশাই করিনি। এখনো মনে হচ্ছে স্বপ্ন।

অনুপম বললো, আজ আমি একটা ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী রইলাম।

—কী রে?

—চল, তেকে এগিয়ে দিতে দিতে বলছি।

অন্ধকারে খুব সাবধানে দেখে দেখে হাঁটতে হয়। নইলে খোঁচট খাবার সম্ভাবনা যখন তখন। তবু রাস্তায় এখন অসংখ্য মানুষ। ঘুঞ্জর খবর শুনে কলকাতা শুদ্ধ সব লোকই বুঝি রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। অন্ধকার প্রায়ই করেছে না। ঠিক এই সময় ঢাকা শহরও নিশ্চয়ই অন্ধকার। কিন্তু সেখানে রাস্তায় একটাও সাধারণ মানুষ এখন আছে কি?

অনুপম বললো, আজ সন্ধ্যাবেলা আমার সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর দেখা হয়েছিল।

—যাঃ, সত্যি?

—আমি কি তেকে বানিয়ে বলছি? উনি আজ রাজভবনে বুদ্ধিজীবীদের ডেকেছিলেন? সেখানে আমিও ছিলাম।

অনুপম কলসজে পড়ায়। খবরের কাগজের প্রায়ই নানা রকম বিষয়ে শ্রবণ লেখে। সুতরাং তাকে নিশ্চয়ই বুদ্ধিজীবী বলা যেতে পারে। সেই তুলনায় সুকুমার নিছক একজন কেরানী। কলসজে পড়ায় সময় অনুপমের তুলনায় তার রেকর্ড খারাপ ছিল না। কিন্তু সুকুমারের জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই।

—আজ ময়দানে ইন্দিরা গান্ধীর মিটিং ছিল জানিস তো?

সুকুমার মনে মনে খানিকটা আশ্চর্য হলে। খবরটা সে কাগজে দেখেছিল বটে। অফিসের কাজে হয় হওয়ায় সে তুলেই গিয়েছিল ব্যাপারটা। নইলে, সকালবেলা সে ভেবে রেখেছিল যে এ মিটিংটা শুনতে যাবে।

অনুপম বললো, ময়দানের মিটিং সেদিন ইন্দিরা গান্ধী এলেন রাজ ভবনে আমাদের কাছে। আমরা প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন ছিলাম। সুচিত্রা সেন, উত্তমকুমার, মৃণাল সেন, সন্তোষকুমার ঘোষ আরও অনেক লেখক ছিলেন। ময়দানের মিটিং—এ বক্তৃতা দিয়ে এসে ইন্দিরা গান্ধী খানিকটা ক্লান্ত থাকলেও আমাদের সঙ্গে হাসিমুখে টুকটাক গল্প করছেন। আর ভেজা টিসু পেপার দিয়ে মুখ মুছেছেন। এই সময় একজন পাঞ্জাবী মিনিট্রী অফিসার জুতো মশমশিয়ে ঢুকলেন ঘরে। সোজা ইন্দিরা গান্ধীর কাছে গিয়ে তাঁর অঙ্গে কী ঘেন্না বসলেন। পকেট থেকে ছিলাম, ঐ অফিসারটিই জি ও সি ইস্টার্ন কমাণ্ড। স্পষ্ট স্পষ্ট ইন্দিরা গান্ধী উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের বললেন আপনারা আমাকে মার্জনা করবেন। আজ আপনারের সঙ্গে বৈশিষ্ট্য থাকতে পারছি না। একটা বিশেষ কাজে আমাকে যেতে হচ্ছে। আবার শিগগিরই কলকাতায় এসে আপনারের সঙ্গে মিলিত হবো। আপনারা চা-টা খান।

এই কথা বলেই ইন্দিরা গান্ধী সেই অফিসারটির সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। দরজার কাছে মুন্সেফী সিদ্ধার্থ রায় দাঁড়িয়ে তিনিও কী ঘেন্না বসলেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। অমনি প্রধানমন্ত্রী ছুটিতে শুরু করলেন। আমরা দেখলাম,

তিনজনা একসঙ্গে ছুটছেন! তখন সাতটা পাঁচটা কী শৌনে ছ'টা। তখনও ব্যাপারটা কী অল্পটা বুঝতে পারিনি। এই খানিকক্ষণ আগে খবরের কাগজের বন্ধু বাবুদের সঙ্গে একটা আড্ডা দিতে গিয়েছিলাম, সেখানেই বুদ্ধ বৈশ্যপার খবর পেলাম। সেই তখনই ইন্দিরা গান্ধী রাজভবন থেকে ছুটে বেরিয়ে একটা জিপ গাড়িতে চেপেছেন। সিদ্ধার্থ রায় লাকি নিজে সেই জিপ চালিয়ে নিয়ে গেছেন এয়ারপোর্টে। তক্ষুদি এয়ারফোর্সেস একটা প্লেনে ইন্দিরা গান্ধী নিম্নী রওনা হয়ে গেছেন। তা হলে ভেবে দাঁখ, সুকুমার, প্রধানমন্ত্রী আর আমরা যুদ্ধ কাগার মুহুর্তটিতে একসঙ্গে ছিলাম। এটা একটা বিরাট ব্যাপার নয়।

—নিশ্চয়ই!

—জিয়ার খবর কী? ও নিশ্চয়ই এই খবর শুনে থাকবে?

—ওরা তো এই খবরটারই প্রতীক্ষা করছিল। এক সময় ওরা নিরাশ হয়ে গিয়ে ভাবছিল, বুঝি ইন্দিরা গান্ধী আর যুদ্ধ নামবেনই না!

কথায় কথায় ওরা অনেকটা চলে এসেছে। অনুপম বললো, তুই এবার যা। আমি একটু তান দিচ্ছি যাবো। একজনোর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

একো হয়ে পড়তেই সুকুমারের আবার ভীষণ ভাবে মনে পড়লো বাড়ির কথা। সেই অন্ধকারের মধ্যে সে ছুটিতে শুরু করলো।

বড়িতে কবে সুকুমার সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে উঠল। সুলেখা দরজা খুলতেই সে উত্তেজিত ভাবে বলল, জানো, যুদ্ধ বেঁধে গেছে।

সুলেখা শান্ত ভাবে বলল, জানি! শিগগির ট্যাক্সি ডাকুন। দিদির খুব ব্যথা উঠেছে। আমি একবার বেরিয়েছিলাম, ট্যাক্সি পাইনি! মা আমাকে অন্ধকারের মধ্যে বেশীক্ষণ রাস্তায় থাকতে দিতে চান না।

সুকুমার ঘরের মধ্যে ঢুকে এক পলক শুধু মায়াকে দেখল। মায়ার বিছানায় শুয়ে ব্যথায় মোচড়াচ্ছে।

যদি একুনি ট্যাক্সি থেকে আসছি! বলেই সুকুমার এক লাফে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু মোড়ের মাথার কোনো ট্যাক্সি নেই। রাস্তায় গাড়ি চলাচলও খুব কমে এসেছে। সুকুমার পাগলের মতন এদিক-ওদিক ছোঁটুটি করতে আগল। পাজার এক ট্যাক্সিচালককে সে বলে রেখেছিল যে মাঝ রাত্রে দরকার হলে যেন তার ট্যাক্সি পায়। কিন্তু এখন তো রাত মাত্র সাতটা নাট।

সেই ট্যাক্সিচালককে বাড়ি পাওয়া গেল না।

মাত্র একটা বিশেষ দিন। হয়তো ট্যাক্সিচালকরাও কোথাও গাড়ি খানিরে রেখে খবর শুনাচ্ছে। রেডিওতে ঘন ঘন খবর বলা হচ্ছে। আজ আর অন্য কিছু চিন্তা করার অবকাশ নেই কারো।

কিন্তু সুকুমার এখন যুদ্ধের কথা ভুলে গেছে। সে শুধু ভাবছে মায়ার কথা। যদি দু' এক মিনিট দেরী হলে মায়ার কোনো ক্ষতি হয়ে যায়?

সুকুমারের তো এ ব্যাপারে কোনো ধারণাই নেই।

ব্রীজের মুখটা কি যে একটা আটুটে গাভির আসতে দেখে সুকুমার কেপেরোয়া ভাবে গাভির সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অন্ধকারের মধ্যে গাভির চালক সুকুমারকে নাও দেখতে পারতো, তবু শেষ মুহুর্তে সে ব্রেক করল। বিকট শব্দ হল ব্রেকের।

সুকুমার ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে ছুটে এসে ব্যাকুল ভাবে বলল, দেখুন, আমার উপায় ছিল না—আমার স্ত্রীর প্রসব বেদনা উঠেছে, যদি তাকে একটু নার্সিং হোমে পৌঁছে দেন, দয়া করে... আপনি যদি একটু... দয়া করে...

গাভির চালকই একমাত্র আরোহী। তিনি কয়েক মুহুর্ত স্থির ভাবে তাকিয়ে রইলেন সুকুমারের দিকে। তারপর অস্ত্রে অস্ত্রে বললেন, আপনার স্ত্রীর প্রসব বেদনা উঠেছে বলে আপনার আবহুত্যা করার কোনো কারণ আছে কি?

—না, মানে, আমি।

—আপনি তো আবহুত্যা করতে যাচ্ছিলেন। নিন, উঠুন।

সুকুমার গাভিতে উঠল। ড্রলোক তক্ষুণি গাড়ি না ছেড়ে ধীরে-সুস্থে একটা সিগারেট ধরালেন।

সুকুমার আবার ব্যাকুল হয়ে উঠে বলল, একটু যদি তড়াতাড়ি—

ড্রলোক হেসে বললেন, আপনি একটু আগে যা করলেন, তার জন্য আমার হাত কাঁপছে, ফুকের মধ্যে টিপটপ করছে। যদি আমি আপনাকে চাপা দিয়ে ফেলতাম! দাঁড়ান, আমাকে একটু স্থির হতে দিন।

একটু থেমে ড্রলোক আবার বললেন, আপনার চিন্তার কিছু নেই। আমি ডাক্তার!

সবাই মিলে ধরাধরি করে ঘরাকে নামানো হল। যন্ত্রণার মায়াব মুখের কথ দিয়ে তখন ফেনা গড়াচ্ছে। জান নেই। ডাক্তারটি তবু বললেন, ডেলিভারি হতে এখনো অন্তত পাঁচ-ছ' ঘণ্টা দেরী আছে—বৈশী ভাববেন না—

সুকুমার বলল, তবু এত যন্ত্রণা—

—বাব! একটি নতুন শিশু রগাচ্ছে, তার জন্য কষ্ট হবে না?

গাড়ি চলবার পর একটু শান্ত হয়ে সুকুমার সুলেখাকে জিজ্ঞেস করল, জিয়া কোথায়? সে এই সময় একটু সহায্য করতে পারল না?

সুলেখা বলল, দুপুরবেলা একটা গাড়ি এসে ওকে ডেকে নিয়ে গেছে। ও বসে গেছে, আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে যেতে পারল না। ওর সঙ্গে আমাদের আর দেখা নাও হতে পারে।



জিয়া কিবল দু'দিন বাদে, দুপুরবেলা। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে দুমদাম করে দরজায় ধাক্কা দিল। তার চুল উন্মো-বুন্মো, পরশে একটা খাঁকি শাট, কপালে একটা সদ্য কাটা নাগ, তাতে বেঞ্জিন আর তুলনা লাগানো।

সুলেখা দরজা খুলতেই সে বলল, বৌদি কোথায়?

সুলেখা এক মুখ হেসে বলল, আপনি তো এখনো খবর শোনেন নি? বিবির একটা ছেলে হয়েছে, খুব সুন্দর ফুটুটে...

জিয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। এই সময় ঠিক কী বলতে হয় সে জানে না। ঠিক কি করে প্রকাশ করা যায় আনন্দ?

সে শুধু বলল, বৌদি আর বাচ্চা দু'জনেই ভাল আছে তো?

—হ্যাঁ। বাবাঃ, যা চিন্তা হয়েছিল! বাবা উঠেছে পরশুদিন রাত্রে, আর বাচ্চা হল সকালে—

—সুকুমারনা নেই?

বড়িতে সুলেখা তখন একা। সুকুমার, বিনতা নবী দু'জনেই হাসপাতালে, সুলেখাও এতক্ষণ ছিল, একটু আগে ফিরে এসেছে বাম্বাবাম্বার জন্য।

জিয়া সব শুনে বলল, বাঃ, ওদের সঙ্গে তাহলে আর সত্যিই দেখা হল না। আমি অনেক কষ্টে ফিরে এলাম—আসবার কথা ছিল না—একটা ছকরী অর্ডার পৌঁছে দেবার জন্য...

—আপনার ফপাজটা কাটলো কি করে?

—ও কিছু না। একটা স্প্লিনটার লেগেছিল। দারুন ঘৃণ হচ্ছে—আপনারা তো টেরও পাচ্ছেন না। অথচ বলকাতার এত কাছে, মাত্র একশো মাইল।

—আসুন, ভেতরে এসে বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

জিয়ার মুখখানা হঠাৎ স্নান হয়ে গেল। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্ততঃ করে নে বললো, বাড়িতে আর কেউ নেই?

সুলেখা বললো, না।

—আপনার মা?

—না। মা-ও নেই। আজ সারাদিন নার্সিং হোমেই থাকবেন।

—তা হলে আমি আর ভেতরে যাবো না। চমি।

—কেন। ভেতরে আসবেন না কেন?

—বাড়িতে আর কেউ নেই, আপনি এলো...এসময়ে আমার থাকা ঠিক হবে না, আমি জানি, এটা অন্যায়।

সুলেখা হেসে কলে বললো, কিসের অন্যায়? আপনারা বেশে বুঝি এ সব ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি আছে? আমাদের এখানে এতে কেউ কিছু মনে করে না।

—আপনার মা কিছু মনে করতে পারেন।

এবার সুলেখারও মুখের হাসি মুছে গেল। মা কি জিয়াকে এবা মথো আড়ালে কোনো কঠোর কথা বলেছেন? মায়ের ওপর খুব রাগ হলো সুলেখার। মায়ের এমন সংস্কার তবো মন! কিছুতেই বকলোনা না! সংস্কার কি মানুষের মন থেকে সব মায়া দয়াও মুছে দেয়। জিয়ার মতন ছেলের মন এমনতেই এখন খুব স্পর্শভাজন হয়ে আছে। ওদের নিজের মন—বাবা। আত্মীয়—স্বজন কোথার কী অবস্থার আছে, কোনো ঠিক নেই। এই সময় কারুর কাছ থেকে একটু নিষ্ঠুর ব্যবহার পেলেই মনে লাগে।

সুলেখা জিয়ার হাত ধরে বললো, আপনি ভেতরে আসুন। আমি বলছি, আমার কথা শুনবেন না?

জিয়া দরজার ভেতরে পা দিল। তারপর খির চেত্রে তাকিয়ে রইলো সুলেখার মুখের দিকে। সুলেখাও চেত্রে পলক ফেলছে না। সে যেন জিয়া নামের একটি পরিচিত ছেলেকে দেখছে না। সে কেবলে একজন স্বাধীনতার সৈনিককে। জিয়ার কপালে একটা লম্বা সন্ধ্যা কটা দগ। সেটাও যেন মানিয়ে গেছে তার মুখের সঙ্গে।

—আমাকে এফুনি যেতে হবে।

—সে কি, খেয়ে যাবেন না? আমার ভাত হয়ে গেছে, ভাত আর আলু সন্ধে খেয়ে যান।

—না, উপায় নেই। আজকেই চুয়াডাঙ্গা কল করতে পড়ব। আমি আজ বাণেশহাটে ঢুকবো—বড় ভাইয়ের কাছে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি—

—কাজে যে দেখলাম, খুলনাতেই সবচেয়ে বেশী লড়াই হচ্ছে।

—তা ছোক না। আজই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থ।

—একটু বসে যান ভাস্কর।

—উপায় নেই, নীচে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমার দু'একটা জিনিস নিয়ে যাবো।

জিয়া হাটে উঠে গেল। ফিরে এসে একটু বসেই। সুলেখা তখনও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

জিয়া আর অপেক্ষা না করে বলল, চললাম! যদি বাঁচি তো দেখা হবে।

সুলেখা বলল—শুনুন।

সিঁড়ির দু'তিন ধাপ নেমেও জিয়া আবার ফিরে দাঁড়াল।

সুলেখা তার চেত্রে দিকে সোজাসুজি চেয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, আমাকে একটা কথা দিয় যান। কথা দিন। সাবধানে থাকবেন?

জিয়া একটু থমকে গেল। তারপর বলল, এটা যুদ্ধ, এখন কি ওসব ভাবলে চলে। যদি মরি, তাতেও আনন্দ।

—তবু ইচ্ছে করে মরার কোন মনে হয় না। বলুন সাবধানে থাকবেন?

—আচ্ছা।

জিয়া আর দাঁড়াল না। দ্রুত নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

সুলেখা দৌড়ে চলে এলো বাস্তার দিকের বাতান্দার। ঝুঁকে পড়ে দেখলো জিয়াকে একটা ডিল গাড়িতে উঠতে। তারপর গাড়িটা হাতফল দেখা গেল সুলেখা সেই দিকে তাকিয়ে রইল।

সুলেখা ঈশ্বর টিপুর কিছু মনে না। পূজা আচ্ছা করে না কখনো। তবু সেই সময় একটু ক্ষণের জন্য হঠাৎ তার ইচ্ছে হলো, কোনো একটা ঠাকুর দেবতার কাছে সে প্রার্থনা জানায় যেন জিয়ার কোনো বিপদ না ঘটে। কিন্তু কোন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানাবে সেটা ঠিক করতে পারলো না বলেই আর কিছু করা হলো না।

মারার ছেলের নাম রাখা হয়েছে জয়। পাঁচ দিন বেটো গেছে, ছেলে আর মা দু'জনেই সুস্থ আছে।

সেদিন সকলবেল সুকুমারের অফিসের গাড়ি নিয়ে কয়েকজন সহকর্মী এসে হাজির। তারা যে চাঁদা তুলেছিল, সেই টাকার জিনিসপত্র কিনে তারা বড়বে পৌঁছে দিত বলে। সুকুমারের বাবার কথা ছিল, সুকুমার কি যাবে?

সুকুমার একটু দ্বিধা করল। সকালে মায়াকে দেখতে যাওয়ার কথা। অবশ্য একটা সন্ধ্যা না গেলেও চলে। শুধু বিনতা দেবী যদি একা যান—সুকুমার সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসতে পারে—

কিন্তু বিনতা দেবী কি রাজি হবেন? সুকুমার বেশ একটু অস্বস্তিকর অবস্থায় মথো পড়লো। সে নিজেই উদ্যোগ করে অফিসে চাঁদা জোনার ব্যবস্থা করেছিল। সে নিজেই প্রস্তাব দিয়েছিল যে চাঁদাটা কোনো কালে জমা না দিয়ে ওষুধপত্র ও কাপড় জামা কিনে তারা নিজের হাতে মুক্তি যোদ্ধাদের দিয়ে আসবে। তখন অবশ্য মায়ার সন্তান জন্মানোর ব্যাপারটা তার মনেই আসে নি।

তার হকর্মী তখন বললো, চলুন না পাশা, সঙ্গে গাড়ি আছে, আমরা বিকলের আগেই তো ফিরে আসছি!

শান্তিভুক্ত কোনেনদিন ভয় পায় নি সুকুমার। বিনতা দেবী সবসময় তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন। কিন্তু আজ সুকুমারের বুক টিপ টিপ করতে লাগলো। তিনি যাঁ বলেন, নিজের স্ত্রী পুত্রের চেয়েও এই সব হৈ হুল্লার প্রতি তোমার বেশী গুরুত্ব?

অনেক ভেবে চিন্তে সুকুমার একটা মিথো বলা ঠিক করলো। সে বিনতা দেবীর ঘরে গিয়ে বললো। কাজ সন্ধেবেলা মায়াকে বসেছে। আজ সকালে আমাকে যেতে হবে না নার্সিং হোমে। আমি গেলে আজ ও খুব রাগ করবে!

বিনতা দেবী অবাক হয়ে বললেন, কেন?

সুকুমার অল্পান বনেন বললো, মায়া তো জানে আমার আজ বড়রে জিনিসপত্র নিয়ে যাবার কথা। আমি যেতে চাইছিলাম না। কিন্তু মায়া মাথার দিবি দিল। ওর নিজেরই তো বেশী উৎসাহ ছিল।

বিনতা দেবী গভীর হয়ে বললেন, তা হলে তুমি যাও।

সুকুমারের বুক দুরু দুরু করতে লাগলো। বিনতা দেবী নিশ্চয়ই নাসিং হোমে গিয়ে মেয়েকে এই কথাটা জিজ্ঞেস করবেন। মায়ার সঙ্গে সুকুমারের এ বিষয়ে কোনো কথাই হয় নি তবু, মায়া কি মুখতে পারবে না? মায়া অস্বীকার করবে? স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যদি এটুকু বোঝাবুঝি না থাকে। তা হলে সে সম্পর্কের মূল্য কী?

মায়া নিশ্চয়ই বুঝবে।

সুকুমার তার সহকর্মীদের বললো, বসুন, আমি একুনি তৈরি হয়ে নিছি।

কথাটা শুনেই সুলেখা একেবারে লাকিয়ে উঠল। অনুভব করে বলল, সুকুমারনা আমি যাবো, আমি যাবো, আমাকে নিয়ে যেতেই হবে।

সুকুমার অবশ্য আগে থেকেই সুলেখাকে নিয়ে যাবার কথা ভেবে রেখে ছিল। তবে আদরের শালিকার এই সামান্য শব্দ সে যেটাতে পারবে না?

বিনতা দেবী বললেন, না, না, অত সব গোলাগুলির মধ্যে মেধেমানুষেরা কখনো যায়?

সুকুমার তাজতাজি বলল, থাক না, কিছু হবে না।

সুলেখা তার মায়ের বোনো আপত্তিতেই কান দিল না। সে যাবেই।

অল্পকণের মধ্যেই ওরা বেরিরে পড়ল। বড়ারে পৌঁছতে যটা দু'এক লাগবে। তবু সুলেখার মনে হচ্ছে, যথ যেন আর শেষই হচ্ছে না।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার প্রায় দু'বছর। বিভিন্ন জায়গায় এখন খন্ড যুদ্ধ চলছে। কবে ঢাকার পতন হবে, সৌজন্য সঙ্কলের উদগ্রীব অপেক্ষা। ইতিমধ্যে বঙ্গোপসাগরে নাকি সেভেনথ ফ্লিট ঢুকছে—এই রকম একটা গুজব ছড়িয়েছে খুব। তা যদি সত্যি হয়, তাহলে যুদ্ধের পতি আবার কেনদিকে ঘুরে যাবে কে জানে।

বড়ারে এসে দেখলো, জায়গাটা একেবারে লোকে লোকারণ্য। ক্যাম্পগুলো থেকে সমস্ত রিকিউজিরা বাইরে বেরিয়ে এসেছে। সঙ্কলের চেষ্টে মুখে অধীর প্রতীক্ষা। শরে শরে হিলিটেরি গাড়ি চল যাচ্ছে পাশ দিয়ে।

এক জায়গায় একটি জিন বছরের শিশু বসে আছে, তাকে ঘিরে বিরাট ভিড়। সুলেখাও কৌতূহলী হয়ে সেই ভিড়ের মধ্যে ঢুক পড়ল। শিশুটি সরল টলটলে দুটি চোখ মেলে অবাক হয়ে সবাইকে দেখছে।

একজন চোঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, খোকা, তোমার নাম কী?

শিশুটি পরিষ্কার গলায় উত্তর দিল, সুবোধ দাস। আমার মা কোপার?

কয়েকজন মহিলা কঁদে ফেললেন।

শিশুটিকে পাওয়া গেছে নাজিরের থেকে। তের জন মৃত লোকের গাফার মধ্যে শুধু এই শিশুটি বেঁচে ছিল। খানসেনারা এসে এই শিশুটির মা—যাবা সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে গুলি করে মেরে রেখে গেছে—শিশুটিকেও নিশ্চয়ই তারা বাঁচিয়ে রাখতে চায় নি—কোনো ক্রমে গুলি লাগেনি তার গায়— পাঁচ দিন ধরে সেই মৃতের স্তূপের মধ্যে সে একলা বেঁচে ছিল, এমন অদ্ভুত তার জীবনীশক্তি। মুক্তি বাহিনীর ছেলেরা গিয়ে তাকে উদ্ধার করে এনেছে।

সুলেখারা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। ইচ্ছামতী নদীতে একটা নৌকো আসছে ওপার থেকে। কয়েকজন লোক তার ওপর আনন্দে লাফাচ্ছে। নৌকোটা কাছে আসতে দেখা গেল তার মধ্যে ছুতে শিকল বাঁধা তিনজন খানসেনা।

বিশাল লম্বা চেহারা মাথার চুল ছোট করে হাঁচি, গায়ে হালকা সবুজ রঙের পোশাক। দেখলে পাঠান বলে মনে হয়। তীতু তীতু বিড়ল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। ওরা একটা ঘোড়ার মধ্যে লুকিয়ে ছিল, সাধারণ মানুষের দল ওদের বন্দী করেছে।

নৌকো এসে ঘাটে ভিড়তেই নর্সকদের মধ্যে একজন লোক ছুটে গিয়ে রাগের চোটে ওদের একজনের গালে এক চড়ু কয়লো। তারপর একটা ইঁট তুলে নিয়ে মারতে গেল।

কয়েকজন ডলারিয়ার এসে আটকলো লোকটাকে। লোকটা তখনও ছুটতেই করে বলছে, মারবো না? আমার বোন, আমার স্ত্রীকে খানসেনারা টেনে নিয়ে গেছে—মারবো না?

ডলারিয়াররা তবু লোকটিকে আটকে রেখে বলল, না, ওরা যুদ্ধবন্দী, ওদের বিচার হবে, এমনি মারা চলবে না।

এক জায়গায় সুলেখারা বড়ার পেরিয়ে বাংলাদেশের মাটিতে পা নিয়ে এল। সুলেখা বলল, আ!

সুকুমার বলল, আমিও চব্বিশ বছর বাদে এই দেশে আবার পা দিলাম।

তারপরেই সুকুমার আবার হেসে বলল, অপচ কিছুই না। একই রকম মাটি। এখানে ওপরে একই রকম সব কিছু... অথচ এখানে পা নিয়েও ঘেঁষা শান্তি! অফিসের এক সহকর্মী বলল, অহরে বাবা, একটু বাতারাত করতে দিলাও তো এত দূর দূর মনে হত না। তা না, তিসা, পাসপোর্ট—খান ত্যান যত আমেজা! এখন নিশ্চয়ই সে সব আর থাকবে না।

পরে শবাবু বললেন, দেখুন, কিছুদিন বাদে আবার কি হয়। হয়তো তিসা পাসপোর্ট সবই হবে।

সবাই পরেশবাবুর ওপর হা হা করে উঠল। সবাই যমকে বলল, আপনি থামুন

তো পরেশবাবু! সব ব্যাপারেই আপনার একটা উল্টো কথা বলা চাই। এখন ওরাও বাঙালী, আমরাও বাঙালী।

পরেশবাবু বললেন, তোমরা এখন অতি উৎসবের চোটে লাফাচ্ছে হাটে, কিন্তু আমি অতটা আশাবাদী নই। সবাই পরেশবাবুর দিকে অবাক চোখে তাকালো। এই সংশয়বাদীদের নিয়ে আর পারা যায় না।

সুলেখা এক সময় চুপি চুপি সুকুমারকে বলল, সুকুমারদা, এখানে জিয়ার খোঁজ করা যায় না?

সুকুমারেরও মনে মনে সেই রকম ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এতবড় বড়ার, এখানে জিয়ার কোথায় খোঁজ পাওয়া যাবে?

বড়ারের এ-পাশে ও-পাশে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প। একটা ক্যাম্পের কাছে এসে একজনকে সুকুমার জিজ্ঞাস করল, আপনি জিয়ারকে চেনেন? সেও আপনাদের মতন মুক্তি বাহিনীর...

সেই ছেলেটি বলল, জিয়া? পুরো নাম কি? কোন্ সেক্টারে ছিল?

এই রে, জিয়ার পুরো নামটা তো মনে পড়ছে না সুকুমারের। এতদিন জিয়া জিয়া বলেই ডেকেছে।

কিন্তু সুলেখার মনে অটুট। সে বলল, জিয়াউর রহমান।

মুক্তিবাহিনীর ছেলেটি বলল, শুধু নাম শুনে তো বোঝা যাচ্ছে না। ঐ নামের অনেক ছেলে আছে। কোন্ সেক্টর বলুন?

সেক্টরের কথা তো জানি না। তবে কথা ছিল বাগেরহাটের দিকে অপারেশনে যাওয়ার।

ছেলেটি বলল, বাগেরহাট? তাহলে আট নম্বর ক্যাম্প গিয়ে খোঁজ করে দেখুন। ওরা যদি বলতে পারে।

ব্রিটিং পাউন্ডারের গধ্ব ম ম করছে চারদিকে। মানুষ মানুষ, অসংখ্য মানুষ। লক্ষ লক্ষ রিকিউজি তো আছেই, এ ছাড়া আছে নানা ধরনের সৈনিক, গুলকাতা থেকেও এসেছে বহুলোক। এরই মধ্যে একটি রিকিউজি ক্যাম্প থেকে এক বৃদ্ধা ডেকে উঠলো, সুকু না? ও সুকু! সুকু!

সুলেখা বললো আপনাকে কে ঘেন ডাকে সুকুমারদা!

সুকুমার পেছন ফিরে তাকালো। সেই বুড়ি পুঁহাত হুড়িয়ে ডাকে, ও সুকু! সুকু!

সুকুমার ভুক ভুক করে কালো, চিনতে পারছি না তো। নিশ্চয়ই অন্য কারকে ভুল করেছে।

ভিড়ের ঠেলায় ওরা আবার চলে গেল অনাটিকে।

খুঁজে খুঁজে আট নম্বর ক্যাম্পটাও বার করা গেল। সেই ক্যাম্পের সামনে প্রচণ্ড ভিড়। কারণ তারা সদ্য বরোজন খানসেনাকে বন্দী করে এনেছে।

সুলেখা নিজেই সুকুমারের হাত ধরে সেই ভিড় ভেদে ঢুক গেল। নানা লোককে জিজ্ঞাস করে একবারে হাজির হল ক্যাম্প কমান্ডারের সামনে। ক্যাম্প কমান্ডার ওদের মুখ জিয়াউর রহমানের নাম শুনে একটু চুপ করে রইলেন। তাবপর জিজ্ঞাস করলেন, আপনারা জিয়াউর রহমানের কে হন? আত্মীয়?

সুকুমারের বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। একথা জিজ্ঞাস করছে কেন? তাহলে কি জিয়া মারা গেছে?

ক্যাম্প কমান্ডারকে সুকুমার কী উত্তর দেবে? জিয়া তাদের কে হয়? কেউ না তো।

সুকুমার বলল, না, আত্মীয় নয় এমনি পরিচিত।

ক্যাম্প কমান্ডার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন আমাদের সঙ্গে।

খানিকটা দৌঁড়ে আর একটা ছোট তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, এটা একটা আমাদের হাসপাতাল। জিয়ার চোট লেগেছে, কিন্তু খুব মারাত্মক কিছু না। সেদে যাবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কি, ও একটাও কথা বলছে না। দেখুন যদি আপনারদের চিনতে পারে বা কথা বলে।

একই খেম্বে তিনি আবার বললেন, অনেক চেষ্টা করে, সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে দিয়ে বাগেরহাট পৌঁছেছিল। কিন্তু তার মাত্র পাঁচ মিনিট আগে একটা গোলায় যা খেয়ে ওর বড় ভাই মারা গেছে।

সুলেখার মুখখানা রক্ত শূন্য হয়ে গেল। সে চেপে ধরলো সুকুমারের হাত।

সুকুমার বললো, পাঁচ মিনিট আগে? বলেন কি?

ক্যাম্প কমান্ডার বললেন, আমাদের ছেলেরা খুঁজনা যশোরের চতুর্দিকে হুড়িয়ে পড়েছে। জিয়া আগে থেকেই খবর পেয়েছিল যে ওর বড় ভাই আছে বাগেরহাটে। বহুদিন তো নিজের কোনো আত্মীয় স্বজনকে দেখে নাই তাই দানার কাছে বারার জন্য প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিল জিয়া। আমাদের ছেলেরা মেশিন গান চালা করতে করতে ঢকে পড়েছে বাগেরহাটে, খানসেনারা তখন পিছু হটেছে। ভিকটি আমাদের। প্রায়ের লোকেরা আমাদের মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল একটা আমবাগানের দিকে। ওখানেই ছিল লোকাল রেজিস্ট্রেশনের খাঁটি। জিয়ারা সেই দিক দৌঁড়েছে, এমন সময় একটা মটারের শেল গিয়ে পড়লো সেই আমবাগানে। এমনই নিয়তি, কী বলবো আপনারদের সেই গোলার ঘরে মাত্র একজনই লোক মারা যায়, আর সেই লোকটিই জিয়ার দাদা।

সুকুমার কপাল কুন্ডলে বললো, ইস! দাদার সঙ্গে কথা বলতে পেরেছিল জিয়া?

কমান্ডার বললেন, না। স্পট ডেথ। সঙ্গে সঙ্গে উনি মারা যান। জিয়া কিন্তু বিশ্বাস করতে পারে নি। সে ছুটে গিয়ে পাগলের মতন ওর বড় ভাইয়ের বুকের ওপর বাঁপিয়ে পড়ে আর এলোমেলো কথা বলতে থাকে। কয়েক মিনিট পরেই

সে আবার দাঁখিয়ে উঠে বলেছিল, বড় ডাইকে বাঁচাতেই হবে। চিকিৎসার দরকার। অন্যরা বোঝাবার চেষ্টা করবে যে আর লাভ নেই, কিন্তু জিয়া কিছুতেই শুনবে না। এলিক জিয়ার নিজের বাঁধেও একটা গুলি লেপেছিল, সেখান থেকে সমানে রক্ত গড়াচ্ছে, কিন্তু সেদিকে ওর জ্ঞপ্তি নেই। বাগেরহাট থেকে মাইল সাতেক এদিকে আমরা একটা মেডিক্যাল সেটার বসাতে পেরেছিলাম। জিয়া একাই তার বড় ডাইকে কাঁধে নিয়ে সেখানে যাবার চেষ্টা করে। তখন কাদের নওয়াজ নামে একটা ছেলে ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো। চিন্তা করে দ্যাখো সেই সাত মাইল রাস্তা, আজও গোলাগুলি চলছে, তার মধ্যে ওরা দু'জন সেই নেহটকে ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে এলো। এ কি সহজ কথা! আসার সময় জিয়া অনবরত বলছিল, আজিজুল তাই, অশনারে আমি খাঁচামু, কোন চিন্তা নাই, ঠিক বাঁচামু! মেডিক্যাল সেটারে পৌঁছবার পর সেখানকার ডাক্তার বললেন, তোমরা কষ্ট করে এতদূর নিয়ে এলে কেন? এতো অনেকক্ষণ আগেই মারা গেছে।

সুকুমারের মনে পড়লো একটা বইয়ের কথা। অল কোয়ার্টেট অব দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট। সে বইতে ঠিক এরকম একটা দৃশ্য আছে। বাউল তার বন্ধু কাউসিনটিকে পিঠে নিয়ে কয়েক মাইল দূরে হাসপাতালে পৌঁছাবার পর সেখানকার ডাক্তার-ও ঠিক এই রকমই কথা বলেছিল। সব যুদ্ধই বোধ হয় একই রকম। একই রকম নিষ্ঠুর বীভৎস।

সুলেখা জিজ্ঞেস করলো তারপর?

কম্যান্ডার বললেন, সেই ডাক্তারটি জিয়াকে দেখে বললেন, তোমারই তো এফুনি চিকিৎসা দরকার। তোমার এই অবস্থা, তার উপর এতখানি পরিশ্রম করলে...। জিয়া সেই মুহূর্তে খুপ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। সেই মে অজ্ঞান হয়ে মুখ বন্ধ করলো তারপর জ্ঞান ফিরলো বটে কিন্তু আর কিছুতেই কথা বলে না। আমরা কত চেষ্টা করলাম। কিছুতেই কিছু হয় না।

সুকুমার বললো, যুদ্ধের সময় এরকম হয়, শুনেছি।

কম্যান্ডার বললেন, আপনারা যেতে চাইছেন বটে, কিন্তু আপনাদের দেখেও সে কথা বলবে কিনা সন্দেহ।

সুকুমার বললো, দেখাই যাক না চেষ্টা করে।

সুলেখা বললো, আমাদের দেশে সে নিশ্চয়ই কথা বলবে।

তাঁবুর দিকে কয়েক পা এগিয়ে সুলেখা থমকে দাঁড়ালো, হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো সে। কাছ দিয়ে আরও সব লোকজন যাওয়া আসা করছিল, তারা একবার শুধু তাকিয়ে দেখলো সুলেখাকে, কিন্তু কেউ বিশেষ গুরুত্ব দিল না সেই কারণে। যুবতী রমণীর কান্না একটি অতি সুন্দর জিনিস, কিন্তু যুদ্ধের সময় এ সব সৌন্দর্যেরও কোন মূল্য থাকে না।

কম্যান্ডার সুলেখার দিকে ফিরে বললেন, আপনারা যেন আবার উতলা হয়ে পড়বেন না। এখন উতলা হবার সময় নয়।

সুকুমার বললো, সুলেখা, তুমি বরং বাইরে দাঁড়াও...

সুলেখা তখনই চোখ মুছে ফেলে শান্ত গলায় বললো, না, আমি যাবো আপনার সঙ্গে।

তাঁবুর মধ্যে আট দশখানা খাটিয়া পাতা। আহতদের মধ্যে দু'একজন কাতরাচ্ছে। এক কোণে একটা খাটে উপুড় হয়ে আছে জিয়া—তার বাঁ হাত আর বুকের পিঠে জোড়া বাঁধেজ।

সুকুমার আর সুলেখা খাটের দু'দিকে দাঁড়াল, সুকুমার মুখ ঝুঁকিয়ে ডাকল, জিয়া! জিয়া!

সুলেখাও ডাকল, জিয়া!

কোন উত্তর নেই, জিয়া মুখটাও ফেরাল না।

সুকুমার কম্যান্ডারকে জিজ্ঞেস করল, এ কি দুমিমে আছে?

কম্যান্ডার বলল, না, ও সব সময় এই রকমই থাকে!

সুকুমার খুব সাবধানে জিয়ার গারে হাত বেখে বললো, জিয়া আমি সুকুমারের। সুলেখাও আমার সঙ্গে এসেছে।

জিয়া তবু কোন উত্তর দিল না।

ক্যাম্পটির মধ্যে মাছি তন্ তন্ করছে। ডেটল, পুঁজ আর রক্তের গন্ধ মিলে একটা দম আটকানো ভাব। সুকুমারের কষ্ট হচ্ছে খুব। বুকের মধ্যে অসহ্য কষ্ট। সে হঠাৎ মন ঠিক করে ফেলল।

সে কম্যান্ডারকে বলল, আমি কি জিয়াকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি?

আমর সঙ্গে গাড়ি আছে। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে যদি ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়—

কম্যান্ডার তীক্ষ্ণ হয়ে বললেন, কেন, বাকি ছেলেগুলো কি দেখে করেছে? তারা এখানে পচে পচে মরবে—আর জিয়াউর একা ভাল চিকিৎসা পাবে—এর কি মানে হয়। আপনি এদের সবাইকে নিয়ে যেতে পারবেন?

সুকুমার বলল, সাহায্য থাকলে সবাইকে নিয়ে যেতাম—কিন্তু আমার যেটুকু সাহায্য, আমি শুধু সেইটুকুই করতে চাই।

কম্যান্ডার সঙ্গে সঙ্গে অনুতপ্ত গলায় বললেন, মাপ করবেন। আমার এখন মাপার ঠিক নেই। দলে দলে ছেলেরা আহত হচ্ছে কিংবা মরছে—জানি না কতদিন এ যুদ্ধ চলবে—কাদের নিয়ে আমরা যুদ্ধ চালাব?

সুকুমার বলল, আর বেশী দিন নেই। আপনারা স্থিতহবেন।

কম্যান্ডার চিন্তিত মুখে বললেন, আপনারা ওকে নিয়ে যাবেন... ব্যাপারটা

ইরেগুলার...একবার হেড তোরাটায়ে জি ও সি কে জানানো দরকার...এনারা যদি পারমিশান দ্যান।

সুকুমার বললো, দেখুন, ওসব আমেলা করতে অনেক সময় লাগবে, তাতে জিয়ার চিকিৎসার অবধা দেবে হয়ে যাবে। ওর ভালো চিকিৎসা হওয়াই আসল কথা। তাই নয় কি?

—কিন্তু ওর দায়িত্ব কে নেবে?

—আমি নিচ্ছি। আমি নিজে নিয়ে যাচ্ছি সব কিছু।

—ঠিক আছে, চলুন!

কম্পাণ্ডার নিজে জিয়ারকে কোলে করে এনে সুকুমারের বাড়িতে তুলে দিলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, আমি এই ছেলেটাকে খুব ভালবাসতাম। তেজী ছিলে। দেববেন যেন ওর চিকিৎসা হয়। আপনারা ওর কে হন বললেন না তো?

৮

সুকুমারের এখন টাকাকড়ির খুব টানাটানি। অফিস থেকে যা খণ্ড নিয়েছিল তা নার্সিং হোমের বিল মেটাতেই শেষ হয়ে গেছে। তবু সে জিয়ার চিকিৎসার কোন ক্রটি করে নি। বন্ধুবান্ধব সবাইকে বলে সে দু'জন ডাক্তারের খোঁজ পেয়েছে, যারা কোন কি নেবেন না। দুই ডাক্তার দু'বেলা এসে দেখে যান। ওযুধ পত্রও তাঁরাই দিচ্ছেন।

দুই ডাক্তারেরই অভিমত এই যে জিয়ার বাঁ-দিকের ঘাড়ের যে ক্ষত হয়েছে, তা মারাত্মক কিছু নয়। কিছুদিনের মধ্যেই শুকিয়ে যাবে, হাতটায়ও কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু মানসিক আঘাতটাই বেশী। তাকে নিয়ে কথা বলানো দরকার।

জিয়ার খবরটা অনুপমকে জানিয়েছিল সুকুমার। কিন্তু অনুপম আসতে পারে নি, সে এখন দারুণ ব্যস্ত। সীমাস্তরের কাছেই সে প্রায় সর্বক্ষণ থাকে। সুকুমারকে অনুপম খবর পাঠিয়েছিল যে জিয়ার চিকিৎসার জন্য কোন টাকা পরমা লাগবে কিনা। অনুপমের উদ্যোগে কলকাতার সমস্ত টাকা জমা দিয়েছে বাংলাদেশ কাণ্ডে। সেখান থেকে অনুপম কিছু টাকা দিতে পারে। সুকুমার রাজি হয় নি। তার নিজের যতদূর সাধ্য সে করবে।

সুকুমার তার সুলেখা সব সময় নানা রকম চেষ্টা করছে জিয়ারকে দিয়ে কথা বলানোর। এখনো কোন ফল পায় নি। জিরা বিছানায় উপুড় হয়ে মুখ ওজ্রে পড়ে থাকে, একটুও সাড়া শব্দ করে না—মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এক এক সময় দেখা যায়, তার বালিশ ভিজে গেছে চোখের জলে।

মকালে বিকেলে মাঝাক নার্সিং হোমে দেখতে যায় সুকুমার। সুলেখা তখন বাড়িতেই থাকে, কারণ জিয়ারকে একা কোলে রেখে যাওয়া যায় না।

মায়া প্রত্যেক দিনই জিজ্ঞাস করে জিয়ার কথা। একদিন সে বললো, জিয়ারকে একদিন এবানে নিয়ে এসো না! ছেলেটাকে দেখতে ইচ্ছে করে।

মায়া'র সব ব্যাপারটা জানানো হয় নি। মায়া শুধু জানে যে জিরা সামান্য আহত অবস্থায় ফিরে এসেছে।

বিনতা দেবীকে নিয়ে খুব ভয় ছিল সুকুমারের। মায়া বাড়িতে নেই, এখন তাদের সংসারে বিশৃঙ্খল অবস্থা, এর মধ্যে একজন গুরুতর অসুস্থ মানুষকে বাড়িতে রাখা সোজা কথা নয়। বিনতা দেবী রাগ করলে সেটাও হতো না। কিন্তু উনি চুপ করে আছেন ব্যাপারটা সম্পর্কে। ভালো মন্দ কিছুই বলেন নি।

সুকুমার চেষ্টা করেছিল জিয়ারকে কোনো ভালো হাসপাতালে ভর্তি করে দেবার। কিন্তু কোনো হাসপাতালেই সীট খালি নেই। অনেককে ধরাধরি করেও বিশেষ কিছু হয়নি। তাছাড়া, সুলেখা চায় না জিরা হাসপাতালে যাক। সুলেখা মন প্রাণ দিয়ে জিয়ার সেবা করছে। সুলেখার মা করে এই নিয়ে আবার রাগারাগি করবে, সুকুমারের সেই ভয় আছে।

রাস্তাঘাটে, বাজারে, সব জায়গাতেই শুধু ঘুরে আসোচনা। এমন কি নার্সিং হোমে পর্যন্ত। এবানেও একটা যেতিও রাখা রয়েছে, কর্ণীরা ঘণ্টায় ঘণ্টায় খবর শুনতে পায়। এক একটা জায়গা পতনের সংবাদ আসে আর সবাই উল্লাসে চিৎকার করে উঠ।

মায়র এক মাসভুক্তো দান একদিন নার্সিং হোমে দেখতে এলেন মায়া'কে। ঐর নাচ বাসুদেব চৌধুরী, বেশ অবস্থাপন্ন। ইলেকট্রিক ওজুসের ব্যবসা করেন। সুকুমার দু'একবার এর বাড়িতে গেছে মার, ধনী আত্মীয় কুটুম্বদের সঙ্গে সে বিশেষ সম্পর্ক রাখে না।

বাসুদেব চৌধুরী মায়া'কে দেখতে এসেছেন নিছক কর্তব্যের বাতিরে। অনেক কিছু জিজ্ঞাসা এনেছেন মায়ার সম্ভানের জন্য। বাসুদেব চৌধুরী বিনতা দেবীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখতে চান, কিন্তু বিনতা দেবী এখন যেতে রাজি হননি।

নার্সিং হোম থেকে বেরিয়ে বাসুদেব চৌধুরী সুকুমারকে বললেন, দৃষ্টিভ্রান্ত দৃষ্টিভ্রান্ত তোমার মুখখানা কালো হয়ে গেছে সুকুমার।

কি উত্তর না দিয়ে সুকুমার এমন একটু হাসলো।

বাসুদেব চৌধুরী বললেন, প্রথম সম্ভান তো বানিকটা দৃষ্টিভ্রান্ত হবেই। চেনা আমার সঙ্গে ক্রাবে চলো, মনটা ভালো হয়ে যাবে, এখন সন্ধ্যাবেলা তো তোমার কিছু করার নেই।

তিনি তাঁর গাড়ির দরজা খুলে দিলেন।

বিনতা দেবী একটু আগে বাড়ী ফিরে গেছেন। সুকুমার একা। আজ জিয়া সারাদিন কিছুই খাটনি, সেজন্য তার মনটা বিষম হয়ে আছে।

সে বললো, না দাদা, আমাকে এমন বাড়িতে ফিরতে হবে।

—কেন? বাড়ি ফিরে কিকরবে? গিগি নেই বাড়িতে।

—বাড়িতে আর একজন মসুহ রুপী আছে।

—কে?

সুকুমার সব ব্যাপারটা খুবে বললো।

শুনতে শুনতে গভীর হয়ে গেলেন বাসুদেব চৌধুরী। তিনি একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, হ, এই ব্যাপার। একজন আহত মানুষের চিকিৎসার সাহায্য করছে, সেটা অবশ্য ভালোই। কিন্তু এই যুদ্ধের ব্যাপারে তুমি খুব মেতে উঠেছো মনে হচ্ছে?

বাসুদেব চৌধুরীর গলার ম্যাকের সুর দেখে একটু আহত হলো সুকুমার। সে বললো, কেন, আপনার বুনিউৎসাহ নেই? তা হলে আপনিই একমাত্র ব্যতিক্রম মনে হচ্ছে।

—যুদ্ধ না নেমে ইন্দিরা গান্ধীর কোনো উপায় ছিল না, সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু এই যুদ্ধ নিয়ে এত মাতামাতি করার কোনো কারণ আছে কি? আমাদের এনিকে যারা মাতামাতি করছে, আমার মতে তারা নির্বোধ। এই যুদ্ধ আমাদের কী লাভ হবে?

—এখানে লাভ লোকসানের কোনো প্রশ্ন নেই। এই যুদ্ধটা হচ্ছে একটা আদর্শের জন্য।

—বাজে কথা বলো না আদর্শ টাদর্শ হচ্ছে খবরের কাগজের কথা! আর রেডিওতে ঐ যে লোকটা গ্লা কাঁপায়... মানুষ সব সময় লাভ লোকসানের চিন্তা করেই চলে। তোমার তো বাড়ি ছিল পূর্ব বাংলার, তুমি কি আশা করছো, যুদ্ধ থামলে তুমি সেই বাড়ি র আশ্রয় ফিরে পাবে?

—না, বাসুদেব না, আমি সে রকম আশা করি না। যারা সে রকম আশা করছে, তাড়াই নির্বোধ!

—কুমিল্লার আমাদের বাড়িটা দেখলে তুমি একথা বলতে পারতে না, সুকুমার। আমাদের তিন পুরুষের বাড়ি, পো-মহলা, সামনে বিরাট আট চালা, আর কত বড় বাগান, প্রায় বারো বিঘর ওপর, কত রকম ফলের গাছ ছিল সেখানে, আরও কত রকমের গাছ নিজের হাতে লাগিয়েছিলেন, সেই বাড়ি আমাদের এমনি এমনি ফেলে আসতে হলো

সুকুমার চুপ করে রইলো।

—পাকিস্তানের পরেও আমরা বছর সাতেক ছিলাম। এক মাসে পর পর তিনবার ডাকাতি হলো আমাদের বাড়িতে। পুলিশে খবর দিয়ে কোনো লাভ নেই। এমন কি থানার আমাদের কেসই সিংহলো না। উল্টে আমাদের বাড়ির বন্দুকটা বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গেল। জেলা সদর খবরে দিতে গেলাম, সেখানকার পুলিশের কর্তা আমরকে কী বললে জানো? সে বললো, আমি হিন্দুস্তানের চর, তাকে পঁচিশ হাজার টাকা ঘুষ না দিলে আমাকে তফসিলি জেলে ভরবে। অনেক দরাদরি করে দশ হাজার টাকা দক্ষিণা দিয়ে আমি সেবার ছাড়া পাই। পরের মাসেই আবার ডাকাতি হলো, আমার বাবাকে কুপিয়ে কুপিয়ে কেটে কেসলো। ডাকাতির সবাই আমার চেনা, অথচ কোনো প্রতিকার হবে না। বাড়ি জমি বিক্রি করেও কোনো উপায় নেই। হিন্দুর সম্পত্তি কেউ কিনবে না। বাধ্য হয়েই সব কিছু ফেলে একদিন চলে আসতে হলো আমাদের। বলো তো, পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশে এরকম হয়? বলা? আমাদের সেই দুঃখ আমরা ভুলতে পারি?

সুকুমার আন্তে আন্তে বললো, এদিক থেকেও অনেককে চলে যেতে হয়েছে ওদিকে। অনেক ট্রেজিডি দু'দিকেই ঘটেছে।

বাসুদেব চৌধুরী স্বংকার দিয়ে বললেন, এদিক থেকে ওদিকে গেছে? ক'জন গেছে? এদিকে সম্পত্তি বিক্রি করার কোনোদিন নিষেধ হয়েছে? এদিকের মতন লক্ষ লক্ষ লোক ওদিকে রিফিউজি ক্যাম্প থেকেছে?

—বাসুদেব না, এখন এসব আলোচনার কোনো মানে হয় না! ইতিহাসের একটা নিষ্ঠুর ট্রেজিডি ঘটে গেছে এক সময়। কিন্তু ইতিহাস অনবরত বদলায়। পুরোনো কথা আঁকড়ে ধরে থেকে কোনো লাভ নেই। তাতে মনের তিক্ততাই শুধু বাড়বে। এখন এসব হিসেব নিকেশ ভুলে যান। ভাইয়ে ভাইয়ে বণগড়া হয়, আবার বাইরে থেকে বিপদ এলে ভাই ঠিক ভাইয়ের পাশে দাঁড়ায়। ওরা স্বাধীনতার জন্য লড়ছে, এখন আমরা ওদের পাশে দাঁড়াবো না?

—বাখো তোমার ঐ সব বড় বড় কথা। এই যুদ্ধের জন্য আমাদের দেশের কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, এ তো আমাদের টাকার টাকা কিন্তু এর বদলে আমরা কী পাবো? পাবো শুধু বদলায়। তুমি দেখে নিও, আমি বলে দিলাম! তোমার এখন লাকাচ্ছে—

—আপনাকে একটা ঘটনা বলি শুনুন! বনগাঁ বড়াবে আমি কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম, তখনও যুদ্ধ লাগে নি। ওপার থেকে লাখ লাখ লোক পালিয়ে এসে এদিকে ক্যাম্প আছে, তাদের মধ্যে অনেক হিন্দু মুসলমান, পাশাপাশি তাঁরুতে থাকে, কোনো রকম গোপমাল নেই। এটা কী করে সম্ভব হলো? বলুন! বাই থেকে, আমি সেদিন হরিদাসপুরে একটা গাঁয়ের দোকানে বসেছিলাম অনেকক্ষণ। লোকজনদায়ের নামটা আমার এখনো মনে আছে, ধীরেন দাস। তার সঙ্গে অনেক

গল্প শুনছিল আমার। তার বাড়ি ছিল বরিশাল, সেও ঘর বাড়ি বেলে চলে এসেছে।
এদিকে, সেই উনিশ শো পঞ্চাশ সালে। ঠিক আপনারই মতন ডাকাতের অত্যাচারের
কথা বলছিল সে। আমাদের সূত্র কথা বলতে বলতে হঠাৎ এক সময় সে লাফিয়ে
উঠলো। চৈতন্যে বললো, আর ও কে? কাশেম আলী না? আমরা তাকিয়ে
দেখলাম, বর্ডারের ওপার থেকে কয়েকজন লোক দৌড়োতে দৌড়োতে আসছে,
তার মধ্যে একজন লুঙ্গি পরা বন্ধা মতন লোক আসছে খোঁড়াতে খোঁড়াতে, বোধ
হয় তার কোনো পায়ে চোট লেগেছিল। সেই দোকানদারটি বললো, হ্যাঁ, এ তো
কাশেম আলী। আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। ধীরে দাস বোধ হয় তার কোনো
পুরোনো শত্রুর দেখা পেয়েছে, এবার বোধ হয় একটা গোলমাল দেখে যাবে।
আমরা ধীরে দাসকে ধরতে গিয়েছিলাম পর্যন্ত, কিন্তু আমাদের হাত ছাড়িয়ে
সে ছুট্টে বেরিয়ে গেল। তারপর সেই লুঙ্গি পরা লোকটিকে জড়িয়ে ধরে চৈতন্যে
প্রায় কৈদে উঠে বললো, কাশেম! কাশেম রে! তুই বেঁচে আছিস। আর কোনো
দিন তোকে দেখবো ভাবিনি! সেই লোকটিকে বললো ধীরে তাই! ধীরে তাই!
আমি সারা রাত্তা আপনার কথা ভাবতে ভাবতে আসছি। তারপর দু'জনে মিলে
কী করায়! তা দেখে আমাদেরও চোখে জল এসে গিয়েছিল। বাসুদেব না, এ
রকম ও তো হয়! মানুষের ইতিহাস এ রকমই বিচিত্র!

বাসুদেব চৌধুরী বললেন, চীপ সেক্টিমেন্ট! এই জন্যই বাঙালী জাতটা উজ্জ্বল
গেল। তুমি শুধু এ রকম একটা ঘটনা দেখলে। আরও যে হাজার হাজার কত
রকম ঘটনা.....

শেষ পর্যন্ত বাসুদেব চৌধুরীর সঙ্গে ঝগড়াই হয়ে গেল সুকুমারের। তর্ক এতদূর
পর্যন্ত গড়ালো যে তারা দু'জনে আত্মীয়তা ভুলে গিয়ে গালাগালি শুরু করে দিল।
সুকুমার বললো, যান, যান! আপনার মতলব আমি জানি। আপনারা ব্যবসারীরা
চান বিরোধটা জিইয়ে রাখতে, তাতেই আপনারদের লাভ বেশী! স্বার্থ ছাড়া আপনারা
কিছুই বোঝেন না।

বাসুদেব চৌধুরী বললেন, ইন্ডিফেটের মতন কথা বলা না, ওরা ধর্ম ছাড়া
আর কিছু বোঝে না। ওরা হিন্দুদের কোনোদিন সহ্য করবে না। হয়তো শেষ
পর্যন্ত ছাত্তাছাতি পর্যন্ত লেগে যেতে পারতো, কিন্তু সেই সময় একটু দূরে একটা
রেডিওর দোকানের সামনে তিড় করে থাকা কিছু লোক রেডিও'র কোনো একটা
ঘোষণা শুনে উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো। সুকুমার অমনি দৌড়ে গেল সে দিকে।

চট্টগ্রাম শহরের পতন হচ্ছে। বান সেনারা চট্টগ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে সেদিন
দুপুরে।

বাড়িতে গিয়ে তক্ষুণি খসড়া জিয়াকে বিতে হচ্ছে হলো সুকুমারের। জিয়ার
ঘরে একটা ট্রানজিস্টার রেডিও রেখে দিয়েছে সুকুমার। প্রায় সব সময়ই সেটা

খোলা থাকে। কিন্তু জিয়া কোনো উৎসাহ দেখায় না। সে একই রকম ভাবে বালিশে
মুখ গুঁথে শুয়ে থাকে। রেডিওতে নানা রকম চমকপ্রদ ঘোষণা হয়, তবু সে
কোনো বাড়ী শব্দ করে না।

বাড়ি ফিরে সুকুমার সোজা ঘরে গেল হানে। জিয়ার ঘরে আগুন নেভানো।
তবু সুকুমার ঘরে ঢুকে উত্তেজিত ভাবে বললো, জিয়া! জিয়া! খবর শুনেছো!
চট্টগ্রাম এখন স্বাধীন! তোমরা অনেক চেষ্টা করেছিলে... এখন তোমার আনন্দ
হচ্ছে না?

জিয়া কোনো উত্তর দিল না।

সুকুমার তবু দু'হাত দিয়ে তাকে হেলতে হেলতে বললো, জিয়া! জিয়া! ওঠো!
চট্টগ্রাম! চট্টগ্রাম এখন তোমাদের! জিয়া!

সুকুমারের নিজেরই অসন্তুষ্ট আনন্দ হচ্ছে। চট্টগ্রাম জর মানে বেশ বড় রকমের
জয়। এই চট্টগ্রামেই প্রথম হঠাৎ জিয়ার রহমান নামে একজন মেজর রেডিওতে
স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল এবং রবীন্দ্র সংগীত বাজানো হয়েছিল। তারপরই
চট্টগ্রামে সামরিক লড়াই শুরু হয়ে যায়। মার্কিন দেশ পাকিস্তানী সৈন্যদের
সাহায্যকারী জনা সেনেডেথ ফ্লিট পাঠাবে এ রকম একটা গুজব উঠেছিল। সেনেডেথ
ফ্লিটকে আসতে হলে এ চট্টগ্রাম বন্দব দিয়েই আসতে হতো। চীন আর আমেরিকা
দু'জনেই পাকিস্তানকে কোন সাহায্য করতে চান, সুকুমার সেটা কিছুতেই বুঝতে
পারে না। ভিয়েতনামের ব্যাপারে চীন আর আমেরিকা সামরিক শত্রু, অথচ
বাংলাদেশের ব্যাপারে তাদের উদ্দেশ্য একই। আশ্চর্য!

সুখে মারাদিন জিয়ার পাশে বসে থেকে তার সেবা করে। ঠিক খড়ি ধরে
ওষুধ বাড়ায়। জিয়া ওষুধ খেতে চায় না। তখন সুলেখা প্রায় জোর করে তার
ঠোঁট ফাঁক করে যিনুকে করে ওষুধ খাইয়ে দেয়।

সুকুমার এক এক সময় বলে, সুলেখা, তুমি বড় বেশী পরিশ্রম করছ। এতে
যদি তোমার আবার শরীর ভেঙে যায়? মাঝে মাঝে তো তোমারও বিশ্রাম দরকার।

সুলেখা লান হেসে উত্তর দেয়, সুকুমারদা, আমার খুব হচ্ছে ছিল, এই যুদ্ধের
সময় মাঝিও কিছু একটা করি। অস্ত্র নার্সের কাজ। তা তো করা হল না,
তবু যদি অস্ত্র একজনের সেবা করেও—

সুকুমার বলল, তা জানি। কিন্তু তোমার মা যদি আবার রাগারাগি করেন—

—মায়ের কথা বাদ দিন! মম্বেরের সব কথা শুনেছে কি চলে?

সুকুমার ক্ষীণ ভাবে হাসলো। তারপর বলল, আমার সবচেয়ে দুঃখ হচ্ছে কি
জানো? দু'একদিনের মধ্যেই ঢাকার পতন হবে—ঢাকার আশে পাশে আমাদের
হতীবহিনী নেমে গেছে—জেনারেল নিয়াজীর আর আশা নেই—

সুলেখা অবাক হয়ে বলল, এতে আপনার হঠাৎ দুঃখ হতে পারে কেন?

—না, মানে, এ-রকম একটা চরম অবস্থার সময়—জিয়ার মতন লক্ষ লক্ষ ছেলে সেই মুহূর্তটার জন্য প্রার্থনা করেছিল এতদিন, কিন্তু মুহূর্তটা যখন আসবে—তখন জিয়া টের পাবে না!

সুকুমার একটু গলা চড়িয়ে বলল, জানো জিয়া, তোমাদের স্বাধীনতার আর দেরি নেই!

জিয়া তবু মুখ ফেরালো না।

সুলেখা বলল, কিন্তু সোভিয়েট ফ্রন্ট? আর এদিক থেকে যদি চাইনীজরা আক্রমণ করে?

—কেউ আসবে না। অন্য দেশের জন্য কেউ চেষ্টা করে লড়াই করতে আসে না। শুধু মুখেই যতকিছু! ত্রিগুন্যনামে আমেরিকানদের যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে!

—আচ্ছা সুকুমার, যুদ্ধ বৈদ্য শেষ হবে, সেদিন বিরাট একটা উৎসব হবে না?

—নিশ্চয়ই হবে!

—আমরা সেদিন কিন্তু এবার বড়ারে যাবো!

—তা না হয় যাবো। কিন্তু জিয়া তো পাজবে না। ওকে ফেলে রেখে আমরা কী করে যাবো!

সুলেখা আর সুকুমার দু'জনেই জিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। জিয়া তবু কোনো সাদৃশ্য করল না। উপড় হয়ে তুরেই আছে এক রকম ভাবে। সে আর মুখ যেন কারকে দেখাতে চায় না। সে এদের কথা শুনেও পাচ্ছে কিনা তাও বোঝাবার উপায় নেই।

দুপুরবেলা খেতে দেয়ে উঠে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানছিল সুকুমার। হঠাৎ এক সময় সে খুব চমকে উঠলো। একটা ব্যাপারে তার ভেতর খুব ভুল হয়ে গেছে। বড়ার ক্যাম্প থেকে সেদিন সে জিয়াকে নিয়ে এলো, তারপর তো আর বাংলাদেশ মিশনকে কোনো খবর জানানো হয়নি। এ কাজটা বে-আইনী নয় তো! জিয়া বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনীর সৈনিক, জিয়ার চিকিৎসার ব্যাপারে ওদের কাছ থেকেও কিছু পরামর্শ নেওয়া সম্ভব।

সবাই যুদ্ধ নিয়ে দারুণ ব্যস্ত, এখন কার সঙ্গে যোগাযোগ করবে? বাংলাদেশ মিশনে যাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে সুকুমারের কেউ চেনা নেই। অনুপমটাকে ধরতে পারলে হতো, কিন্তু তার তে পাতাই পাওয়া যায় না।

তবে সুকুমার বেরিয়ে পড়লো অনুপমের বাড়ির উদ্দেশ্যে।

সেখানে কেউ নেই। অনুপমের ফ্লাট একেবারে ফাঁকা। অতগুলো ছেলে থাকতো, জায়গাটা দারুণ জঘন্যমন্ট ছিল! অনুপম তো নেই-ই, ওর স্ত্রীও বেরিয়ে গেছে দরজায় তাল বন্ধ।

সুকুমার কিরেনই আসছিল, এই সময় দেখলো একটা লম্বা মতন ছেলে পকেট থেকে চাবি বার করে অনুপমের বাড়ির দরজার তাল খুলছে।

সুকুমারের কৌতূহল হলো। এই ছেলেটিকে সে আগে কখনো দেখেনি।

সুকুমারকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে ছেলেটিও গিয়ে তাকালো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, আপনি কারে খুঁজছেন?

—আমি তো অনুপমকে খুঁজছিলাম।

—উনি তো বড়িয়ে গেছেন, আজ কিরবেন না।

—ও!

—আসুন না, ভেতরে এসে বসুন।

—আপনার নাম কী ভাই?

—লুৎফর। লুৎফর রহমান।

—আমি আগে কবেকবার এসেছি এখানে। আপনাকে দেখিনি।

—আমি দিন কয়েক হলো এসেছি। আগে অন্য জায়গায় থাকতাম, সেখানে লোক বেড়ে গেছে, তাই অনুপমদা আমাকে এখানে থাকতে দিয়েছেন।

যে বরাতে আগে অন্য সব ছেলেরা থাকতো, সে ঘরে এখনো তাল ও মতরফি পাতা। সেখানেই সুকুমারকে বসালো লুৎফর। কসাঁ ছিপছিপে চেহারা, ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল, বেশ সুবর্ণন ছেনেটি।

যমের মধ্যে একটু শীত শীত ভাব। দু' একদিন ধরে শীতটা জমিয়ে পড়েছে।

লুৎফর ঘরে ঢুকই একটা রেডিও চালিয়ে নিল। প্রতি ঘণ্টার ঘণ্টার বিশেষ নিউজ জুলাটন প্রচারিত হচ্ছে। এখন নতুন কিছু খবর পাওয়া গেল না। যশোর ক্যান্টনমেন্ট দারুণ লড়াই চলছে।

কই করে রেডিওটা বন্ধ করে লুৎফর বলল আপনি বসুন দাদা, আমি একটু ঘানটা সেবে নিই।

সুকুমার বললো, আমি এবার উঠি বরং।

—আপনি একটু বসুন না। আমি তো একা আছি, একটু গল্প করা যাবে!

সুকুমারের অবস্থা বিশেষ কাজ নেই এখন। সেই সন্ধ্যাবেলা যারাকে দেখতে যাবে।

লুৎফর দু'মিনিটের মধ্যে ঘান সেবে এলো। লম্বা চুলগুলো মুখের ওপর ঝুলে পড়েছে। আপন মনেই সে বললো, একটা চিরুপি, ভেবেছিলাম একটা চিরুপি কিনবে দূর ছাই, মনেই পাকে না। দেখি বৌদির ঘবে আছে কিনা।

পাশের ঘরে ঢুকে গিয়ে সে একটা বড় সাইজের মেয়েলি চিরুপি নিয়ে এলো। অবশ্য আজকালকার ছেলেরা যে রকম বড় বড় চুল রাখে, তাতে মেয়েলি চিরুপিতেই তাদের পক্ষে সুবিধে।

তারপর লুৎফর বললো, খুব দুখী পেশেছে। দেবি, বৌদি কী রান্না করে রেখে গেছেন?

রান্নাখরটি এ ঘরের সঙ্গেই লাগানো। সেখানে ঢুকে পড়ে লুৎফর আবার চৌচিরে জিজ্ঞেস করলো, দাদা, আপনি পেয়ে এসেছেন। কিছু খাবেন?

—না আমি খেয়ে এসেছি।

—আমি খাবেনই বা কী! আচ্ছোতা খিচুড়ি। ওই দিনের পর দিন খিচুড়ি খেয়ে খেয়ে আর পারি না! পেটটাও একবারে চড়া পড়ে গেল। কখন যে চাটী গরম ভাত, আর ডাল ছি নিয়ে মেখে খাবো। সঙ্গে কয়েকখানা ইচা মাছ ভাজা....। দাদা, আমি ডিম ভাজা করছি আপনি একটা ডিম ভাজা খান অন্তত।

—না ভাই, আমি এখন কিছুই খাবো না।

বেলা তিনটে বাজে। ছেলেরা এতক্ষণ না খেয়ে আছে। খিচুড়ির চোটেই বোধ হয় সে খুব তাড়াতাড়ি খাবার শেষ করে এলো।

—দাদা, আপনার কাছে সিগ্রেট আছে?

লুৎফরের ব্যবহারের মধ্যে কোনো আড়ষ্টতা নেই, খুব সহজ ভাবে সে নতুন চেনা মানুষের সঙ্গেও কথা বলতে পারে।

সত্যকথিত ও পর শুয়ে পড়ে বেশ আরাম করে সিগারেট টানতে লাগলো লুৎফর।

সুকুমারের একটা খটকা লাগলো। এর বয়েসী সব ছেলেরা যুদ্ধ করতে চলে গেছে, কেউ বা আহত হয়েছে, কেউ কেউ মারাও গেছে, আর যুদ্ধের এই চরম সময়ে লুৎফর একা একা এখন রয়ে গেছে কেন!

এ কথাটা সে মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করেই ফেললো।

লুৎফর হাসতে হাসতে বললো, দাদা যুদ্ধ মানে কি শুধু বন্দুক নিয়ে লড়াই? যুদ্ধের সময় আরও অনেক রকম কাজ থাকে। ধরে নেন, সেরফমই কিছু একটা কাজ আমি করছি।

—কী কাজ?

—সেটা বলা এখন নিষেধ আছে। আপনাকে দেখে আমি প্রথমে একটু ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। দুপুরবেলা, ফাঁকা বাড়ি, তাবলাম, আমাকে কেউ ঘেরে ফেলে দেবার জন্য এসেছে নাকি!

—তোমাকে মারবে কেন? কে মারবে?

—তার কি কোনো ঠিক আছে! কত রকম স্পাই সোরাফেরা করছে!

—স্পাই? কাদের স্পাই?

—পাকিস্তানের স্পাই!

—পাকিস্তানের স্পাই তোমাকে মারবে কেন? তুমিও তো পাকিস্তানের লোক!

—আমি পাকিস্তানের লোক? দাদা, আপনি ভুলে গেছেন যে বাংলাদেশ

এখন একটা স্বাধীন আলাদা দেশ। কয়েকটি রাষ্ট্র আমাদের বাংলাদেশকে স্বীকৃতিও দিয়েছে।

সুকুমার লজ্জা পেয়ে গেল। সত্যি সে ভুল করে ফেলেছিল। আসলে এটা ঠিক ভুলও নয়। মনে মনে সে বাংলাদেশই ভাবছে, কিন্তু মুখে বলে কেলসে পাকিস্তান। অনেকদিনের অভ্যাস তো।

সে কলসো, কিন্তু পাকিস্তানের স্পাই কলকতায় আসবে কী করে?

—আপনি ভাবছেন এখানে পাকিস্তানের স্পাই নেই? গিস-গিস করছে। নইলে জলজাতার খবরের কাগজে কী বেরকছে না বেরকছে তা সেইদিনই সকালে করাচী রেডিও থেকে প্রচার হর কী করে? এদিকবদর বজারের সব খবরও ওয়া জানে। আমাদের অস্থায়ী সরকারের দু'জন কর্মীকে হুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অনেকের ধারণা পাকিস্তানের স্পাইরা তাদের গুম করেছে।

সুকুমার বললে, ওরে বাবা! এই সব তো জানতাম না।

—আপনাকে বললাম না, যুদ্ধের সময় বন্দুকের লড়াই ছাড়াও আরও অনেক ব্যাপার থাকে!

—আচ্ছা ভাই, বাংলাদেশ মিশনে তোমার চেনাশুনো আছে নিশ্চয়ই। আমার একটা স্বাক্ষর ছিল।

—ও দরকার বসুন।

—আমার বাড়িতে তোমাদের মুক্তি বাহিনীর একটি ছেলে অসুস্থ অবস্থার আছে।

—জিয়া তো?

—তুমি জানলে কী করে?

—আমাদের ববর রাখতে হয়।

—যাক, নিশ্চিত হওয়া গেল, আমি ভেবেছিলাম, কোনো খবর দেওয়া হর নি...তুমি চেনো জিয়াকে?

—খুব ভালোই চিনি। ওকে বলবেন আমার নাম, লুৎফর রহমান, ও ঠিক বুঝবে।

—সই তো হুজির, ও এখন কিছুই বুঝছে না। আমাদের কোনো কথার উত্তর দেয় না। নিজেও কোনো কথা বলে না— ডাক্তাররা চিকিৎসা করছেন অবশ্য, কিন্তু আমরা ভয় পেয়ে যাচ্ছি।

—আপনাকে একটা কথা বললো, সুকুমারদা? ওকে দু' চর না চড় জপড দিন তে খুব জোরে, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

—হাঃ, তা কি হয়! বড় ডাক্তাররা দেখছেন, কিছু হচ্ছে না।

—অনেক সময় আচমকা আঘাত দিলে কাজ হয়। যাকগে, বাংলাদেশ মিশনকে আপনার কী জানাতে চান? ওকে সরিয়ে নিতে হবে? আপনার অসুবিধে হচ্ছে?

—না, না, আমাদের কিছুই অসুবিধে নেই। আমি শুধু ভাবছি, তোমাদের যদি আরো ভালো কিছু চিহ্নসার ব্যবস্থা থাকে।

—বেধুন দাদা, আপনাকে একটা কথা বলি। জিয়াটা ভাগ্যবান, যে আপনাদের বাড়ির মতন কোনো গ্রাইন্ডে বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে। সেখানে ও মেহ, হমতা, যত্ন পাবে। হাসপাতালে হাজার হাজার রুগীর সঙ্গে থাকার চেয়ে এই ব্যবস্থা হাজার গুণ ভালো।

এতে ও যদি সুস্থ না হয়, তা হলে ও হাস্পাতাল আর কোনো আশা নেই।

—তুমি জিয়ার সঙ্গে দেখা করবে? যদি তোমাদের দেখে ও কিছু বলে....

লুৎফর তড়াক করে উঠেপড়ে হাতখড়ি দেখলো। তারপর বললো, হ্যাঁ। যেতে পারি। আমি গিয়ে সত্যিই ওকে দু'খানা চড ক্যাবো ঠিক। কিন্তু তার আগে যে আমার আর এক জামগার যেতে হবে? এক কাজ করলে হয়? আপনিও চলুন আমার সঙ্গে, আমি কাজ সেরে নেবো, আপনি একটু বসবেন। তারপর আপনার সঙ্গেই যাবো আপনার বাড়িতে?

—খুব বেশী দেরী হবে না তো? আমাকে আবার নার্সিং হোমে যেতে হবে।

—নার্সিংহোমে আবার কী ব্যাপার?

—আমরা স্ত্রী আছেন বেশনে।

—আপনার স্ত্রী নার্সিংহোমে আর বাড়িতে আপনি জিয়ার মতন একজন অসুস্থ ছেলেকে রেখেছেন?

উত্তর না দিয়ে সুকুমার হাসলো। লুৎফরও হাসলো সুকুমারের চোখের দিকে চেয়ে। সেই হাসিতে অনেক কথা হয়ে গেল।

রাস্তার বেরিয়েই লুৎফর একটা টাক্সি ভাবলো। সেটার উঠতে উঠতে সে সুকুমারকে বললো, ভাড়াটা কিন্তু আপনাকেই দিতে হবে। বেধুন না, আপনার বাড়িতে গিয়ে আজই আমি গারিয়ে তুলবো জিয়াকে।

মৌলানির কাছে একটা বাড়ির সামনে থামলো টাক্সিটা। বিরাট বড় জ্যাট বাড়ি। টাক্সির ড্রাইভারের দিকে সুকুমার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো লুৎফরের সঙ্গে। একতলা, দোতলা, তিনতলা পেরিয়ে ওরা উঠে এলো পাঁচতলার ওপরে, ঘরে। মস্ত বড় ছাদ, সেখানে জিন আর দর দ্বিগে অরেকটি অস্থায়ী ঘর বানানো হয়েছে, ঘরগুলোতে রয়েছে সাত আটটি ছেলে আর নানা বয়সের যত্নপাতি, তিনটে টেলিফোন আর দুটো ওয়ারলেস সেট। ছেলে গুলি খুব ব্যস্ত, অনবরত টেলিফোন বাজছে, ওয়ারলেস সেটে ঘরঘর শব্দ হচ্ছে, একটি ছেলে কিছু একটা খবর পাঠাচ্ছে মন দিয়ে।

লুৎফর বললো, এটা আমাদের একটা গুরু আস্তানা। আপনি নিজাদের লোক বলে আপনাকে নিয়ে এলাম, বাইরের কাউকে কিছু বলবেন না।

সুকুমার বললো, সে তো নিশ্চয়ই!

লুৎফর ছাদে একটা বেঞ্চির ওপর সুকুমারকে বসিয়ে একটা ঘরে ঢুক গেল। খানিকটা বাদেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, নানা চা খাবেন?

সুকুমার বললো—না।

—আমরা ঠিক আশপাশে লাগবে এখানে। আপনি একটু বসতে পারবেন?

—হ্যাঁ, বসছি।

—দাদা, খবর খুব খারাপ। সেডেন্থ ফ্লিট এগিয়ে আসছে। আর আমাদের কোনো উপায় নেই।

—এ খবর তো আগেই শুনেছি।

—এখন ব্যাপারটা অনেক সিরিয়াস। ইন্ডিয়ান এশান থেকে যে অফ বেঙ্গলে ঢুক পড়েছে সেডেন্থ ফ্লিট। চট্টগ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে। মার্কিন সেডেন্থ ফ্লিটের সাহায্য পেলে আর পাকিস্তানীদের হারানো অসম্ভব।

—সেডেন্থ ফ্লিটের কথা তো আগে থেকে জানাই ছিল। ইন্দিরা গান্ধী কিছু একটা ব্যবস্থা করে রেখেছেন নিশ্চয়ই।

—দাদা, সেডেন্থ ফ্লিটের সঙ্গে কি আর ইন্ডিয়ান আর্মি টক্কর দিতে পারবে? মার্কিনরা এমন ভাবে বিট্টে করলো আমাদের।

—একি রশিয়া আছে। রশিয়া কি এখনি এখনি ছেড়ে দেবে ভাবছো? রশিয়া ঠিক একটা কিছু পাল্টা ব্যবস্থা নেবে।

সে তো আরও সর্বনাশের কথা। রশিয়া আর আমেরিকা যদি এখানে যুদ্ধে নেমে পড়ে তাহলে আমাদের দেশটা আর একটা ভিয়েতনাম হয়ে উঠবে। সে যুদ্ধ কতদিন চলবে কে জানে। দেশটা ছাড়খাবে যাবে তা হলে। আপনাদের ভারতও তখন বাধ পড়বে না।

—ইতিহাসের যা নিয়তি তাই হবে। তুমি আমি তো আর ইতিহাস বদলাতে পারবো না!

লুৎফর ঢুক গেল আর একটা ঘরের মধ্যে। সুকুমার দেখতে পাচ্ছে যে সে একটা ওয়ারলেস সেট নিয়ে কানে হেড ফোন লাগিয়ে বসেছে।

খানিকক্ষণ পর আরও পাঁচজন ছেলে ঘেরে উঠে এলো ওপরে। তাদের কথাবার্তা শুনে দর থেকে বেরিয়ে এলো কয়েকজন। দুটি মেয়ে আর একটি ছেলে একটি টুলের ওপর বসলো, অন্যরা তাদের ঘিরে উত্তেজিত ভাবে কথাবার্তা বলতে লাগলো। একটি মেয়ে জেঁদে ফেললো হঠাৎ।

সুকুমার কৌতূহলী হয়ে কাছে এগিয়ে গিয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে তাই?

সে ছেলেটি সন্দেহভরা চোখে আপাদ মস্তক একবার দেখে নিয়ে বললো, আপনি কার সঙ্গে এখানে এসেছেন?

—সুফর রহমানের সঙ্গে।

—ও। এই তিনজন ঢাক থেকে এসেছে। মোজা পায়ে হেঁটে। কাল রাত্তিরেই পৌঁছেছে।

—এই যুদ্ধের মাঝখানে দিয়ে ওরা এলো কী করে?

—আসছে, এরই মধ্যে আসছে। ওদের কাছ থেকে রাস্তার খবর পাওয়া যাবে অনেক। সেইজন্যই এখানে এসেছি।

একটা মেয়ে কথা বলতে গিয়েই কেঁদে ফেলছে। ওরা খান সেনার নতুন পড়েনি। কিন্তু রাস্তায় জের-ডাকাত বহুসাস লোকেরা ওদের ওপর অনেক রকম অত্যাচার করেছে। অন্য মেয়েটি গভীর। ছেলেটি কিন্তু হাসছে।

সুকুমার একটা ব্যাপার জেনে অবাক হয়ে গেল। ছেলেটি হিন্দু, মেয়ে দুটি ওর বোন। ছেলেটি ছিল ঢাকার, মেয়ে দুটি নারায়ণগঞ্জের কাছে এক গ্রামে।

সুকুমার জিজ্ঞেস করলো, আপনি ভাই এতদিন ঢাকায় ছিলেন কী করে?

ছেলেটি উত্তর দিল যে তার এক মুসলমান বন্ধু তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। এত বিশদের মধ্যেও বন্ধুটি ভয় পায় নি। বেশ বিশদেই ছিল ছেলেটি। তাতে তার সাহস বেড়ে যায়। গতমাসে একদিন সাহস করে একটা বাজারে বেরিয়েছিল, ঠিক সেই সময় খান সেনারা বাজার ঘেরাও করে সবাইকে ধরে ফেললো।

—তারপর আপনি ছাড়া পেলেন কী করে?

—ছাড়া কি আর পোতা? বুকের সামনে মেশিনগান তুলেছিল। চোখ বুজে তখন ভগবানকে ডাকছি। যদিও জানি, ভগবানও আলকাল ঢাক শুনলে সাড়া দেয় না।

—কী হলো তখন?

—খান সেনারা প্রত্যেকের নাম জিজ্ঞেস করছে। আমার বুকের সামনে মেশিনগান, কোনো মিথো নাম মুখে এলো না। যদিও হিন্দুর নাম শোনা যাবে ওরা এলি করে। তবু নিজের নামটাই বলে ফিলাম।

—তারপর?

—বৈঁচে গেলাম এ নামের জোরেই, আমার নাম বিহারীলাল সিংহ। নাম শুনেই খান সেনারা বললো, তুমি বিহারী? ঠিক হ্যাঁ, চলা যাও!

অমনি একটা হসির ধুম শব্দ গেল। একজন বললো, ব্যাটদের মাথায় গোবর পোয়া।

বিহারীলাল বললো, এ গোবরের জন্যই তো বৈঁচে গেলাম!

সুফর বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, আপনারা ঢাকা থেকে আসবার পথে প্রথম নদী পেরুলেন কোথায়?

—আরিচা ঘাটে।

—সেখান থেকে এখনো পার হওয়া যায়? খানসেনারা পাহারা নিচ্ছে না?

—আছে পাহারা। আসু পৈয়াজের বস্তা ভরা নৌকো পার হচ্ছিল, সেই নৌকায় স্ক্রিয়ে ফিলাম।

—সেই নৌকো সার্চ করে নি?

—না।

সুফর একজনের দিকে ফিরে বললো, এদের পুরো কুইট নোট করে নাও শুনে শুন্। কোনো ডিটেলস যেন বাদ না যায়। আমি রাত্তিরে এসে দেখবো। চলুন, সুকুমার!

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সুকুমার বললো, তোমাদের এখানে এলে অনেক রকম ঘটনা জানা যায়।

—আসবেন মাঝে মাঝে।

—ছেলেটি কী আশ্চর্য উপায়ে বেঁচে গেছে!

—যুদ্ধে এরকম হয়। আবার যার মরার কোনো কথাই নয়, সেও হঠাৎ মরে যায়। আমাদের কত ভালো ছেলে সামান্য ভুলের জন্য প্রাণ দিয়েছে।

বাড়ি পৌঁছোবার পর দরজা খুলে দিলেন বিনতা দেবী। সুফর তাঁকে সুকুমারের মা ডেবনিয়ের টিপ করে এক প্রণাম করে ফেলে বললো, মাসীমা, আমি আপনার জরি এক ছেলে। আমার নাম সুফর।

বিনতা দেবী চমকে একটু সিঁড়িয়ে গেলেন।

সুকুমার বলে ছল প্রমাদ ওগলো। বিনতা দেবী যদি এর সঙ্গে রাত ব্যবহার করেন, তাহলে লজ্জায় তার মাথা কটা যাবে।

সুফর বললো, মাসীমা, এক কাপ ভালো চা খেতে চাই। তিন চামচ চিনি!

বিনতা দেবী অবশ্য কোনো কট্টতি করলো না। স্নানকালে ভাবে ছেলে বললেন, আচ্ছা, দিচ্ছি চ।

সুকুমার তাড়াতাড়ি বললো, চলো, আগে জিয়ারকে দেখে আসি।

জিয়ার ঘরের দরজা তেজলো। ছানের অফিসের কাছে নড়িয়ে আছে সুলেখা। বিষন্ন, উদাসীন মুখ। বিকেলের দিকে এরকম মুখের তার ছলে মেয়েদের বেশী সুন্দর নোয়।

সুকুমার সুলেখাকে ডেকে তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল সুফরের। তিনজনে জিয়ার ঘর তুললো।

জিয়ার ঘুমিয়ে আছে।

সুফর পা টিপে টিপে তার কাছে গিল্ল কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বিকট ভাবে 'হলুম' বলে চিৎকার করে ওঠলো।

জিয়ার তাতেও চমকে ওঠলো না। চোখ মেললো আন্তর্য আন্তর্য। নিশ্চল দৃষ্টি।

জিয়া আবার চুপ করে শুয়ে পড়লো।

হাল ছেড়ে দিয়ে লুফকর বললো, নাঃ আমি পারলাম না। বোম্বের সঙ্গে লড়াই করা আমার সাতো কুলোরে না।

৯

সুকুমার খেয়ে-দেয়ে একটু বেরিয়েছে। বিনতা দেবী পেছনে মাথার খাবার নিয়ে। মারা আর দু'এক দিনের মধ্যে সম্ভান নিয়ে বাড়ি ফিরে আসবে।

সুলেখা জিয়ার জন্য খাবার তৈরী করে ওপরে নিয়ে গেল। জিয়া কিছুই খেতে চায় না। সুকুমার আর সুলেখা তাকে জোর করে খাওয়ার। পাতলা ভাত কোল দিয়ে মেখে চামচে করে মুখে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। অবুখা শিশুর মতন জিয়া মুখ থেকে খাবারটা বের করে দেবার চেষ্টা করে। তখন সুলেখা তাকে ধমকায়। অনুন্নয় বিনয় করে।

এ রকম ভাবে আর বেশীদিন চলবে না। কাল রাত্তিরেই সুকুমার বলছিল, ভাতাররা পরামর্শ নিচ্ছেন জিয়াকে কোনো মানসিক হাসপাতালে পাঠাবার জন্য। বাড়িতে আর ঠিক মতন চিকিৎসা হচ্ছে না। সুলেখার মন তাতে সায় দেয় না, অথচ উপায়ই বা কী?

সেদিনও সুলেখা জোর করে তার মুখ ঘুরিয়ে খাবার খাইয়ে দিল। আজ আরও কম খাবার খেল জিয়া। খাবারটা মুখে দিলেই মুখ বিকৃত করে ফেলে। এই ক'দিনই বেশ বোকা হয়ে গেছে ছেলেটা। সুলেখা অনেক বুঝিয়ে—সুঝিয়ে, বকুনি দিয়েও তাকে পুরোটা খাওয়াতে পারল না। তখন সে খুব অসহায় বোধ করল। এর চেয়ে বোধ হয় হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল। সেখানে নার্সরা ঠিক মতন খাওয়াতে পারবে। সুলেখা তো আর পারছে না কিছুই। সে তো এসব জানে না।

খাওয়া কোনক্রমে শেষ হতেই জিয়া আবার দপ করে শুয়ে পড়ল।

সুলেখা আরও বিতুষকণ বসে রইল সেখানে। তার ফিরে পেয়েছে, তবু এতুনি নীচে যেতে হচ্ছে করছে না। টেবিল থেকে সে জিয়ার কবিতার খাতটা টোলে নিয়ে পাতা উল্টে দেখতে লাগল। জিয়ার হাতের লেখা খুব সুন্দর। কয়েকটা বানান ভুল আছে অবশ্য। তা ছাড়া সে সস্তরকে সস্তর, কোনোদিনকে লেখে কুনোদিন।

পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সুলেখা শেষ কবিতায় এসে থামল। ওই কবিতাটা জিয়া ঘেন্না লিখছিল, সেদিন সুলেখা হঠাৎ এসে পড়ায় জিয়া লজ্জা পেয়েছিল।

কবিতাটা কয়েকবার পড়ে পড়ে সুলেখা মানে বোঝার চেষ্টা করল। এমন সময় দরজার কাছে একটা ছায়া পড়ল। সুলেখা দেখল, তার মা।

সুলেখার দুখটা করিন হয়ে এল। বিনতা দেবী কোনদিন ওপরে আসেন নি।

বিনতা দেবী কখন যে নার্সিং হোম থেকে ফিরে এসেছেন, সুলেখা টেবিলে পায় নি।

বিনতা দেবীর হাতে একটা পাখরের বাটি। তিনি মেয়ের মুখের দিকে কয়েক পলক চাখিয়ে রইলেন। তারপর আঁতে আঁতে জিরেস করলেন, ও এখনো কথা বলে ন?

সুলেখা সংক্ষেপে জানাল, না!

—সুকুমার বলছিল, ওকে নাকি হাসপাতালে দেবে?

সুলেখা আরও করিন হয়ে বলল, এখনো কিছু ঠিক নেই।

—তুই উঠে আর ওখান থেকে।

—কেন।

—বলছি, উঠে আয় না।

সুলেখা তার মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করার জন্য তৈরি হলো। মা কেন এমন সংস্কারে পরিচয় দেন!

বিনতা দেবী বললেন, বিদেশ বিড়ুরে ছেলেটা একলা হাসপাতালে পড়ে থাকবে, সেটা মোটেই ভাল কথা নয়। আমি খানিকটা শতমুদী আর চন্দন বেটে এনেছি, এটা একটু কপালে আর পেটে লাগিয়ে দাখ না। শুনেছি এতে অনেক কাজ হয়।

সুলেখা যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। জিয়ার জন্য নিজের হাতে ওষুধ বেটে এনেছেন। উনি তো প্রথম থেকেই জিয়াকে অশুভন্দ করেছিলেন।

বিনতা দেবী ঘরের মধ্যে এসে বললেন, তুই সব, আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। তিনি জিয়ার কপালে মোটা করে মেখে দিলেন সেই শতমুদী আর চন্দনের প্রলেপ। তারপর গোল্ডিটা সরিয়ে নাড়ির কাছেও লাগাতে লাগলেন। আর মুখে বলে যেতে লাগলেন, আহরে, ছেলেটা মোটে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওর দাদাকে পেল না! এত বড় করে, এতদিন পরে, মোটে পাঁচ মিনিটের জন্য...একি কম দুঃখ...এ দুঃখ কি জীবনে ঘাবে? ওর বাপ মা কোথায় আছে, কতদিন দেখে নি...তারা এখনো জানে না, কিংবা না জানলে কি হবে মায়ের প্রাণ ঠিক আনচান করছে...দু'দিন রাত্রে সব ছেলে যখন ঘেমে ফিরবে, ওর মাও তো ছেলেকে বুঁজবে...ছেলেবেলা পেছা মায়ের প্রাণ—

জিগ মুখ জিরিয়ে দেখলো বিনতা দেবীকে।

তিনি আরও গরম গলায় বললেন, ভয় নেই, সেয়ে যাবে, ঠিক সেয়ে যাবে, আহরে মুখানা শুকিয়ে গেছে একবারে, কতদিন মাকে দেখে না....

জিয়া হড়মড় করে উঠে বসে বলল, মা!

তারপরই সে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বিনতা দেবীর হাত চেপে ধরল।

বিনতা দেবীও চোখের জলসামলাতে পারলেন না। তিনিও বঁদতে লাগলেন। জিয়ার মাথায় হাত দিয়ে বলতে লাগলেন, তোমার দাদা নেই, এখন তোমার মাকে ডো তুমিই দেখবে— মায়ের প্রাণ...ওরে বাবা, মায়ের প্রাণে যে কত কষ্ট... সন্তানের জন্য মায়ের...

সুলেখা চোখের জল সামনে জড়াতাড়ি ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল। সে আর সুকুমারদা যা পারে নি, তার মা তাই পেরেছে। তার মা জিয়ার মায়ের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন দরজা খুলে।

জিয়া তখনও বিনতা দেবীর হাত জড়িয়ে ধরে বলে যাচ্ছে, মা, মা, আপনিও আমার মা। আপনি বলুন। আমি আমার মাকে খুঁজ পাচ্ছি তো।

পারি যে, নিশ্চয়ই পারি। আমি বলছি সব ঠিক হয়ে যাবে।

বিনতা দেবী ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই সুলেখা তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললো, মা, মা, তুমি দারুণ কাজ করেছো। তুমি অসাধ্য সাধন করেছো, তুমি এতো ভালো মা... একুশি সুকুমারদাকে খবর দিতে আমি টেলিফোন করতে যাচ্ছি...

সেদিন সন্ধ্যাবেলা জিয়া নিজের উঠে বসে খাবার খেল। কথা বেশী বলে না অবশ্য, সব সময় তাঁনে। সুকুমার দীর্ঘ তলা থেকে রেডিওটা এনে রাখল জিয়ার ঘরে। রেডিওতে আধ ঘণ্টা অস্তর অস্তর নতুন খবর আসছে। অবশেষে শোনা গেল, ভারতীয় সেনা ও মুজিাহিদির যৌথ ফ্রন্ট ঢাকার ঢুকে পড়েছে, সেখানে পথে পথে যুদ্ধ চলাছে।

পরদিন খুব সকালবেলা অনুপম আর তাঁর স্ত্রী শান্তা এসে হাজির। সুকুমারকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে জিজ্ঞাস করল, জিয়া কেমন আছে রে?

সুকুমার একটু শূন্য ভাবে বলল, ভাল থেকে একটু ভাল আছে। কিন্তু তুই তো এর মধ্যে একবারও দেখতে এলি না।

অনুপম কটমট করে তাকাল সুকুমারের দিকে। তারপর কটোরভাবে বলল, আমাকে শুধু জিয়া নয় আরও অনেকের খবর রাখতে হয়। তুই জানিস আতাউর মায়া গেছে?

সুকুমার জিজ্ঞাসিত ভাবে বলল, আতাউর? তার মানে আতা! সেই হাসিখুশী ছেলেরা?

—হ্যাঁ।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সুকুমার বলল, অনুপম, তুই এ খবরটা জিয়াকে এখন দিস না। ও এখনো ওা দাদার মৃত্যুর শোকটাই সহ্য করতে পারে নি পুরোপুরি—

অনুপম ধমক দিয়ে বলল, সে কথা তোকে শেখাতে হবে না! আমি জানি কারকে কি বলতে হয়। চল, জিয়াকে একবার দেখে আসি।

শান্তা তার স্বামীকে বলল, আ, তুমি সবাইকে অত ধমকে কথা বলছ কেন? আজ কি রাগান্বিত করার দিন!

সুকুমারের দিকে ঘিরে বলল, আপনি কিছু মনে করবেন না। প্রায় তিন রাত্রি ওর ঘুম হয়নি, তাই মেজাজ ঠিক নেই।

অনুপম বলল, চল, ছেলটাকে দেখে আসি।

জিয়াও তখনো খুমেজিলা, অনুপম দরজার ধাক্কা দিয়ে তাকে জাগাল। দরজা খুলেই জিয়া বলল, অনুপমদা? শান্তা বৌদি।

তার গলার আওয়াজ স্বাভাবিক সুস্থ লোকের মতন। কিন্তু পরক্ষণেই তার চোখ জলে ভরে এল—

অনুপম কড়া গলায় বলল, ঠিক আছে। এখন তো ভালই আছো দেখছি। এখন আর অত কালাকাটি দরকার কি। আস্থা আমি চলি।

জিয়া বলল, অনুপমদা, আমার বড় ভাই,

তাকে ধমিয়ে দিয়ে অনুপম বলল, আমি জানি, তোমার দাদা আজিঙ্গুল ধীরের মতন যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছে। তার জন্য আজ কালাকাটি করার কি আছে? এটা মনে রেখো, আজিঙ্গুলের মতন আরও অনেকের ভাই, দাদা, বাবা এই যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। তারা সবাই মিলে যদি আজ কাঁদতে শুরু করে, তাহলে আজকের স্বাধীনতাটা আসবে শেখের মশা দিয়ে। কিন্তু স্বাধীনতা সব সময়েই আনকের, উৎসবের। কিছু লোকের অস্বস্তিগা ছাড়া স্বাধীনতা আসে না। ঠিক আছে, চলি।

সুকুমার বলল, এত ব্যস্ত হয়ে চললি কোথায়? চা খাবি না?

—না, সময় নেই। একুশি বাংলাদেশ মিশনে যেতে হবে আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জেনারেল মিয়াজী ঢাকার আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করবে। এম মধ্যেই, স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। একটি দল আজই মাতঙ্গীরায় গিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে স্বাধীন সরকারের কাজ শুরু করবে। ছেলেরা আমাকে ধরেছে, 'ওদের সঙ্গে যশোরে যেতে।

জিয়া চোঁচিয়ে উঠল, অনুপমদা, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? যশোরে?

—হ্যাঁ।

—আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব! যশোর থেকে মাদারিপুর বেশী দূর নয়, সেখানে গেলে আমি আমার মায়ের দেখা পাব।

অনুপম ঠাট্টা করে বলল, ইস, আর যেন কাকুর মা নেই! একুশি মাকে না দেখলে চলবে না। অবিতা টবিতা জিখলে এরকম দুর্বলই হয়। ঠিক আছে, যদি যেতে চাও আমি তোমাকে ঠিক দু'ঘিনিট সময় দিতে পারি, তার মধ্যে যদি উড়ার হয়ে নিতে পার—

সুলেখা বললেন, আমরা যেতে পারি না? সুকুমারদা, আমরা যাবো না?

সুকুমার বললো, হ্যাঁ, গেলে হয়?

অনুপম বললো, আমি কিন্তু দু'মিনিটের বেশী সময় দিতে পারবো না!

শুধু জিয়া নয়, সুকুমার অর সুলেখাও তৈরি হয়ে নিল। রাস্তায় বেরিয়ে তারা একটা টাক্সি পেয়ে গেল। একটু দূরে যাবার পর জিয়া জিজ্ঞেস করল, অনুপমদা, আপনারা কি যশোরে গাড়িতে যাবেন?

— হ্যাঁ।

— সে গাড়িতে আমার জায়গা হবে তো?

অনুপম জিয়ার সুস্থ দিকের কাঁধটায় একটা চাপড় মেরে বলল, রাখা কোথাকার! আমি যে আজ সকালে তোকে নিয়ে যেতেই এসেছিলাম, তা বুঝিস নি? দেশ স্বাধীন হচ্ছে, আর তুই বিছানায় পড়ে থাকতে চেয়েছিলি?

বাংলাদেশ মিশনের সামনে কতকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তা প্রতিনিধি নতুন দ্ব্যাগ হাতে নিয়ে তৈরি হয়েই দাঁড়িয়েছিল, ওরা গিয়ে পৌঁছেতেই সবাই গাড়িগুলোতে উঠে পড়ল।

উত্তেজনার মধ্যে সুকুমার প্রথমটা খেয়াল করে নি। টাক্সি থেকে নেমে সে আর সুলেখাও আর একটা গাড়িতে উঠে পড়েছে জিয়া আর অনুপমদের সঙ্গে। আসফাকুল সাহেব নামে আরও একজন রয়েছেন গাড়িতে। গাড়ি চলেছে সীমান্তের দিকে।

ধানিকটা দূরে যাবার পর সুকুমারের খেয়াল হল সে কোথায় যাচ্ছে? যশোর পর্যন্ত গেলে আজ আর ফেরাই হবে না। কিন্তু আজ ১৬ই ডিসেম্বর, আজ সকালেই মাঝা আর তার ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার কথা। মারা অপেক্ষা করে বসে থাকবে।

সবাই উত্তেজিত ভাবে যুদ্ধের গল্প করছে। কত বকর ঘটনা কত হাসি—কম্বোয় মেশা কাহিনী। এর মধ্যে সুকুমার নিজের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তুলতে লজ্জা পাচ্ছিল। কিন্তু গাড়ি জমশ বুকে চলে যাচ্ছে। আর চক্ষুজ্ঞার কোন মানে চা না।

সুকুমার আমোকা চোঁড়িয়ে বসে উঠল, গাড়িটা একটু থামান।

অনুপম জিজ্ঞেস করল, কেন? আবার গাড়ি থামাতে হবে কেন? আমাদের এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে।

— আমি নেমে যাব!

সকলেই অবাক হয়ে প্রায় এক সঙ্গে বলল, সে কি। আপনি যশোরে যাবেন না?

সুকুমার বলল, আমার উপায় নেই, আমাকে কিরে যেতেই হবে। জরুরী দরকার আছে।

— হী এমন জরুরী দরকার?

সুকুমার লজ্জিত ভাবে মুখ নীচু করল। তারপর অনুপমকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমার একটা ছেলে হয়েছে জানিস তো? তাকে আজ বাড়িতে আনব। আমি আজ যেতে পারব না ভাই!

অনুপম বলল, ঠিক অর্থাৎ, তোর ছেলেকে কান্দা আনিস। আজ এমন একটা উৎসব হিস করবি?

সুকুমার বলল, আমার কাছে আমার ছেলেকে আজ বাড়ি আনাই সবচেয়ে বড় কথা। সেইটাই আমার কাছে আর সবচেয়ে বড় উৎসব! সুলেখা নেমে এস।

সুলেখা আপত্তি করল না। সে—ও জানে জরুরী আজ বাড়ি আনবার কথা। দিদি নার্সিং হোমে অধীরভাবে অপেক্ষা করবে। আজ অন্য কোথাও যাওয়ার প্রায় ওঠে না।

সুকুমারের নির্দেশে গাড়ি থেমেছে। সুলেখা সুকুমারের সঙ্গে নেমে পড়ল।

জামালা দিগে মুখ বাড়িয়ে আসফাকুল সাহেব একটা গালভরা ভাষায় বললেন, ঠিক আছে সুকুমারবাবু। আপনি আজ আপনার শিশু সন্তানকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন, আমরাও আমাদের শিশু প্রাণীতাকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে বাচ্ছি।

উত্তর দেবার বদলে সুকুমার হাসল। তারপর হাত নেড়ে বলল, আচ্ছা!

সুলেখা বললো, আমার দিদির ছেলের নাম আমি রেখেছি জয়। আজ ১৬ই ডিসেম্বর সে বাড়িতে আসছে। নামটা কী রকম সার্থক বলুন তো!

খট মরে গাড়ি থেকে নেমে এস জিয়া।

সুকুমারের সামনে এসে বলল, সুকুমারদা, একটা কথা।

কিন্তু তারপর সে চুপ করে গেল। কী কথা যে সে বলবে, তা ভেবে পেল না। সে কিছু বলতে চায়, কিন্তু ভাষা নেই।

গাড়ি সবাই তাকে তাক দিচ্ছে, তাই সে একটু পরে অতিকষ্টে ভাঙা ভাঙা ভাবে বলল, সুকুমারদা, আমি চলে বাচ্ছি...জামিনা আর দেখা হবে কিনা...আমাকে আপনার মনে থাকবে তো?

শেষ কথাটা সে বলল সুলেখার দিকে তাকিয়ে। সুলেখার বদলে উত্তর দিল সুকুমার সে আবেগের সঙ্গে বলল, কেন মনে থাকবে না জিয়া? দেখা হবেই বা না কেন? নিশ্চয়ই দেখা হবে...জিয়া তোমাকে আমরা চিরকাল মনে রাখব...কখনো ভুলতে পারি?...তুমি তো আমাদেরই একজন...আমরা যাব, তুমি আমার আসবে...যখন আসবে, সোজাসুজি আমাদের বাড়িতে এসে উঠবে, যে কোনদিন...আমরা অপেক্ষা করে থাকব....

সুলেখা জিয়ার চোখের দিকে হির ভাবে তাকিয়ে ছিল। এক সময় চোখ নামিয়ে নিল। সে কোন কথাই বলতে পারল না। তার চোখ খালী করে কান্না আসছিল। কিন্তু এই মুহুর্তে সে কিছুতেই কাঁদবে না।

জিয়া বললো, আমি ঘাবড়াসে, শিপনিয়ই আসবে, দেখা হবে, নিশ্চয়ই
দেখা হবে। মাকে বৌদিকে আমার নমস্কার দেবেন...

অনুপম জিন্দাকে তার নিজ।

জিয়া আবার নিম্নে উঠতেই ছেড়ে দিল গজলি। জিয়া তার বাতুলতা বাঁধা ছাত্তরী জানলার বাইরে বাড়ির দিকে নাড়তে লাগল— সুকুমারও ছাত্তরী নাড়তে লাগল। গজলিটা ছুটে গেল গজলির সঙ্গে— তারপর গজলিটা বাকি ঘুরে গেল। সন্ধ্যা এক প্রাণপণে গির হয়ে দাঁড়িয়ে।

